কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের

জীবন-চরিত।



শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়,

অধ্যাপক, বেঙ্গল ন্যাশানল কলেজ, কলিকাতা।

রাজসাহী সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি

বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক

লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।

[মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

৬৪।১ ও ৬৪।২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্, "লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্" হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
ও
প্রকাশক—শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত।
লোটাস লাইব্রেরী,—৫০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

উৎসর্গ

যাঁহার

কলিকাতা বিশ্ববিত্থালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলর-

পদে অধিষ্ঠানকালে

বাঙ্‌লা সাহিত্য বিশ্ববিত্থালয়ের নিকট সাহিত্যের

মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে,

যিনি বাঙ্‌লা সাহিত্য ও সাহিত্যিকের অকৃত্রিম

বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক,

বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসে যাঁহার বিশ্ববিদ্যা-

লয়ে অধ্যক্ষতাকাল স্বুবর্ণ অক্ষরে

উল্লিখিত হইবে,

সেই

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী,

এম, এ, ডি, এল, ডি, এস, সি, সি, এস, আই,

মহোদয়ের উদ্দেশে এই সামান্য গ্রন্থ

গভীর শ্রদ্ধার সহিত

উৎসর্গীকৃত হইল।

সূচীপত্র

চিত্রসূচী।

ভূমিকা।

ইংরাজি শিক্ষার প্রাদুর্ভাব সময়ে জন্মগ্রহণ করিলেও ঈশ্বর গুপ্ত ও কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এই দুইজনের কাহাকেও ইংরাজি শিক্ষার স্রোত স্পর্শ করে নাই। সম্পূর্ণ স্বদেশীয় কবি কবিকঙ্কণের সহিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের তুলনাকালে মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু বলিয়াছেন—"কবিকঙ্কণ নিঃসংশয়রূপে বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রধান কবি। কি মানবস্বভাবপরিজ্ঞান, কি বাহ্যজগদ্বর্ণনানৈপুণ্য, কি করুণারসের উদ্দীপনাশক্তি, কি সুকল্পনা, সকল বিষয়েই তিনি অদ্বিতীয়। * * * বিশেষতঃ প্রতিভা বিষয়ে তিনি বাঙ্গালা ভাষার অদ্বিতীয় কবি। ভারতচন্দ্র তাঁহাকে অনেকস্থলে অনুকরণ করিয়াছেন। * * * এসিয়ার কিংবা ইউরোপ খণ্ডের এমন কোন কবি নাই, যাঁহাকে মাইকেল মধুসূদন অনুকরণ করেন নাই। স্বকপোল রচনাশক্তি বিষয়ে মোটা ধুতি ও দোজা পরিধানকারী দামুন্যার দরিদ্র ব্রাহ্মণ শোভন ধুতি ও উড়ানি পরিধানকারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুসভ্য সভাসদ্ ভারতচন্দ্র এবং কোট পেণ্টুলন পরিধানকারী মাইকেল মধুসূদনকে জিতিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই।" * এস্থলে বসু মহাশয় ইংরাজী প্রভাবের পূর্ব্বকালীন কবি মুকুন্দরামকেই শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন।

দেখিতে পাওয়া যায় মার্কিন দেশীয় দার্শনিক এমার্সন প্রাচ্যের আদর্শ দ্বারাই অনুপ্রাণিত। তাঁহার Oversoul বেদান্ত বলিলেও চলে। কথায় কথায় তিনি একদিকে গীতা ও উপনিষদ আবার

* বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা। ১৩ ও ১৪ পৃষ্ঠা।

অপর দিকে হাফিজ ও সাদী উদ্ধৃত করিয়াছেন; কনফুশিয়স ও লুয়ের বচনও বাদ যায় নাই। উপনিষদোক্ত নচিকেতার উপাখ্যান উল্লেখ করিয়া তিনি তাঁহার অমরত্ব (Immortality) শীর্ষক প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন।

ফিজজিরাল্ড কৃত ওমর খৈয়ামের অনুবাদ অনুবাদ বলিয়া পরিচিত হইলেও ইংলণ্ডের স্থায়ী সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। কাব্য ও নাট্য সাহিত্যে চসার এবং সেক্ষপীয়রের মত জগতে আর কেহ ঋণ করিয়াছেন কিনা জানি না। এই সম্পর্কে এমার্সন বলিতেছেন,—

"Shakespeare did owe debts in all directions, and was able to use whatever he found; and the amount of indebtedness may be inferred from Malone's laborious computations in regard to the first, second and third parts of Henry VI, in which out of 6, 043 lines 1, 771 were written by some author preceding Shakespeare, 2, 373 by him, on the foundations laid down by his predecessors and 1, 899 were entirely his own. And the preceding investigation hardly leaves a single drama of his absolute invention." * অন্যত্র বলিতেছেন,— "Chaucer is a huge borrower, Chaucer, it seems, drew continually through Lydgate and Caxton, from Guido di Colonna, whose Latin romance of the Trojan war was in turn a compilation from Dares Phrygius, Ovid and Statius." * ইহার পর চসার অন্যান্য কবিদিগের রচনা হইতে

Representative Men. Shakespeare, or the Poet.

ঐরূপ শোষণ করিয়াছেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা সত্বেও চসার ও সেক্ষপীয়রের অসামান্যতা কেহ অস্বীকার করিতে সাহস করিবেন না। পরের নিকট হইতে ভাব লওয়া দোষাবহ নহে, কিন্তু তাহা গড়িয়া পিটিয়া নিজস্ব করা চাই। এইরূপ শোষণ ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষা প্রসার লাভ করিতে পারিবে না। সুখের বিষয় এদিকে আমাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। স্বর্গীয় ভাই গিরীশচন্দ্র সেনের তাপসমালা ও কোরাণ শরীফের বঙ্গানুবাদ আমার কথার সাক্ষ্য দিবে। এই দুইখানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া তিনি দেশের মহা উপকার করিয়াছেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের কবিতা শুধু অনুবাদ নহে। তিনি স্বয়ং কবি ছিলেন, গ্রন্থকার তাহা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। ম্যাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও কামিনী রায়ের কবিতা পড়িতে পড়িতে মিল্টন, শেলী ও টেনিসনকে মনে পড়ে, সেজন্য তাঁহারা শেষোক্ত কবিগণ অপেক্ষা হীন বলিতেছি না। কৃষ্ণচন্দ্র পারসিক কবিদিগের ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে ক্ষুদ্র বলিতে পারি না; গড়িয়া পিটিয়া তিনি অন্যের ভাব নিজের করিতে জানিতেন।

কোথাও বিলাসিতার আধিক্য দেখিলে আমরা তাহাকে "নবাবী চাল" বলিয়া থাকি। এ কথাটী আমাদের দেশে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। হজরৎ মোহম্মদ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে নিঃস্পৃহতা, স্বার্থত্যাগ ও ঈশ্বরে নির্ভর তাঁহাদের অন্তঃকরণে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। খ্রীষ্টবাদীদিগের তীর্থস্থান জেরুজালেম নগর যেরূপে মুসলমানদিগের অধিকারে গিয়াছিল তাহার বিবরণ লিখিতে গিয়া জন উইলিয়ম ড্রেপার লিখিয়াছেন,—"There had been mis-

understandings among the generals at the capture of Damascus followed by a massacre of the fleeing inhabitauts. Sophronius, therefore, stipulated that the surrender should take place in the presence of the khalif himself. Accordingly, Omar, the khalif, came from Medina for that purpose. He journeyed on a red camel, carrying a bag of corn and one of dates, a wooden dish, and a leathern bottle." * রাজকার্য্যে বহির্গত হইবার সময়ও তাঁহাদের আড়ম্বর প্রকাশ পাইত না, এমন কি যাঁহারা রাজরাজেশ্বর তাঁহারাও পর্ণকুটীরবাসী চীরবাসপরিহিত ভিক্ষাজীবী ধার্ম্মিক ফকিরকে কন্যা সম্প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক বরং শ্লাঘা জ্ঞান করিতেন। † কিন্তু যখন ইসলামের অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত বিজয় বৈজয়ন্তী বোগদাদ হইতে মাদ্রিদ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ব্যাপিয়া উড্ডীয়মান হইল, তখন তাহারা দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া ভোগ ও বিলাসিতাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সংসারের অনিত্যতা, ত্যাগজনিত সুখ (ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুঃ), অনন্তে নিমজ্জিত থাকা, ঈশ্বরের সঙ্গে সহবাস সুখ ভোগ প্রভৃতি আমাদের নিজস্ব বলিয়া ভ্রম হয়; শেষোক্ত ভাব আমাদের বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে সর্ব্বদাই দেখা যায়। অন্য দেশেও যে এই সকল ভাবের যথেষ্ট বিকাশ হইয়াছিল পাঠক এ গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাইবেন।

আমরা বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতির সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

---

* The conflict between Religion and Science, page 90.

† তাপসমালা দ্রষ্টব্য।

ইহা আহ্লাদের বিষয় যে আজ কালি আমাদের প্রতিভাশালী ব্যক্তি-দের জীবন-চরিত পাঠ করিবার জন্য ব্যগ্রতা জন্মিয়াছে। জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুবিল্ব, রামপ্রসাদের জন্মস্থান কুমারহট্ট, মাইকেলের জন্মস্থান সাগরদাঁড়ি ও কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মস্থান সেনহাটি প্রভৃতির নাম দিন দিন জনসমাজে সুপরিচিত হইতেছে। আজ সেনহাটির বিবরণ জানিবার জন্য লোকে এত উৎসুক কেন? এমার্সন এ কথার উত্তরে বলিয়াছেন—"The race goes with us on their credit. The knowledge that in the city is a man who invented the railroad, raises the credit of all the citizens." * বংশ-প্রভাব ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানবের চরিত্রগঠনে কিরূপ সাহায্য করে, গ্রন্থকার তাহার সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।

লেখক একস্থানে পাগলদিগের গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন; আমিও আমার এক গ্রন্থে বলিয়াছি—"যত কিছু বড় বড় আবিষ্কার তাহা অনেক সময় ক্ষ্যাপা বা মাথাপাগলা লোকের খেয়াল হইতে উদ্ভূত।" † ইহা অতি সত্য কথা। অতিরিক্ত হিসাবী লোক জগতে কোন মহদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছে এরূপ স্মরণ হয় না।

শ্রীমান্ ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থে চিন্তাশীলতা ও গবে-ষণার পরিচয় দিয়াছেন। কত শ্রম করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া তাঁহাকে উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, পাঠক গ্রন্থ অধ্যয়নকালে তাহার পরিচয় পাইবেন। গ্রন্থকার নিজেও কবিত্বশক্তিসম্পন্ন, সুতরাং কবির চরিতাখ্যায়ক হইবার তাঁহার স্বতঃই অধিকার আছে।

* Representative Men—Uses of great men.

† নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি—৫৩ পৃষ্ঠা।

আশা করি এই উপাদেয় গ্রন্থখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের অল্পসংখ্যক জীবন-চরিত গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার পক্ষে সহায়তা করিবে।

আমার এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিবার কোন অধিকার নাই। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনধিকার চর্চ্চায় এই কয় পংক্তি লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। তবে আমার এক স্বাভাবিক অধিকার আছে—এবং এই জন্যই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছি—কবি কৃষ্ণচন্দ্র খুলনা জিলায় জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

চারি পাঁচ বৎসরের শ্রমের পর কবি কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনচরিত প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সাধারণের নিকট আমার কয়েকটি কথা বক্তব্য আছে।

কৃষ্ণচন্দ্র সাধু ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইংরাজী অধিক জানিতেন না বটে, কিন্তু সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। তাঁহার বর্ত্তমান জীবনচরিত লেখক কি জ্ঞানে, কি চরিত্রগৌরবে, কোনো বিষয়েই তাঁহার চরিতাখ্যায়ক হইবার উপযুক্ত নহেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমি কেন এরূপ মহাত্মার জীবনচরিত রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম, ইহার উত্তরে আমার একটি মাত্র কথা বলিবার আছে। বাল্যকালে যখন অন্যান্য কবিতার সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের কবিতা পড়ি, তখনি তিনি আমার প্রাণমন কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার কবিতার সহিত পাশাপাশি মুদ্রিত অন্যের কবিতাগুলি বিশেষ কোন অপরাধ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু সেগুলি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। বয়স বাড়িল, বাঙলা কবিতা বিস্তর পড়িলাম, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রকে ভুলিতে পারিলাম না। তাঁহার রচনা সম্বন্ধে আমার যে একটা মোহ ছিল, সেই মোহই দিন দিন বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে আমাকে এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছে। মোহবশতঃ মানুষ যাহা করিয়া থাকে, তাহা প্রায়ই মঙ্গলপ্রসূ হয় না; বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যে তাহার বিপরীত হইবে, আমি এতটা আশা করি না।

কবি কৃষ্ণচন্দ্রকে ভালো করিয়া জানিবার জন্য আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভবপর, তাহার নিয়োগ করিতে আমি কিছুই অবশিষ্ট রাখি নাই। এই গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমি ১৩১৩ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত অক্লান্তভাবে শ্রম করিয়াছি। যখন যাঁহার কাছে কোনো তথ্য পাইবার সম্ভাবনা জানিয়াছি তখনি তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়াছি, সম্ভব হইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। এজন্য আমাকে দুইবার ঢাকায়, তিনবার সেনহাটি, তিনবার যশোহর এবং কয়েকবার খুলনায় যাইতে হইয়াছে। অনেকে আমার অনুকূলতা এবং কেহ কেহ আমার কার্য্যে প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছেন। প্রতিকূলতার মধ্যে আমাকে যথেষ্ট সংগ্রাম

করিতে হইয়াছে। এই প্রতিকূলতা দূর করিবার জন্য যাঁহারা শ্রম করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কর্ম্মক্ষেত্রে আমার সহযোগী ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত এম্, এ মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে মজুমদার-কবির ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নামও আমি কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি। প্রথমবার আমি যখন সেনহাটিতে আসি, তখন আমি নিতান্ত অসুস্থ, একপ্রকার অন্যের স্কন্ধে ভর করিয়া চলিতে হইত : সেই সময়ে সেনহাটি-গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত ও দ্বিতীয়বার আমি যখন নানাপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যে সেনহাটিতে আসি, তখন পরমকল্যাণভাজন শ্রীমান্ নরেশচন্দ্র সেন আমার সহিত গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। শেষোক্ত শ্রীমান্ গ্রীষ্মকালের রৌদ্রে, বিনা পাদুকায় ও বিনা আতপত্রে আমার সহিত অক্লান্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তাঁহার সেই উৎসাহপূর্ণ তরুণ মুখকান্তি আমি আজও ভুলিতে পারি নাই।

খুলনায় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন বি, এল্, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এল্, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সেন প্রভৃতি আমার কার্য্যে নানা দিক্ হইতে সহায়তা করিয়াছেন ও নানা বিষয়ে পরামর্শ দিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন—আজ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শুভ অবসর উপস্থিত—তাঁহারা আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

যশোহরে রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম্, এ, বি, এল্ আমাকে তথ্য সংগ্রহে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। দুইটি মুসলমান বন্ধুর নাম এ ক্ষেত্রে উল্লেখ না করিলে অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইবে। ইঁহাদের একজনের নাম মৌলভি মঞ্জুরাল হাফেজ ও অন্যজনের নাম মৌলভি আবদুস্ শোভান। ভাবিতেও আনন্দ হয় যে, কবি কৃষ্ণচন্দ্র শুধু হিন্দুর নিকট শ্রদ্ধা পাইয়াছেন এমন নয়, তিনি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেরই শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন।

ঢাকায় আমি প্রথমবার যখন যাই, তখন রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি, আই, ই, মহোদয় জীবিত ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আমি সামান্য কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শেষবারে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায়,প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত

কালীপদ বসু এম্, এ, প্রভৃতি আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। পাঠক এই গ্রন্থে কৃষ্ণচন্দ্রের যে চিত্র দেখিতে পাইবেন, তাহা বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত হীরালাল সেন মহাশয়ের গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে লওয়া হইয়াছে। হীরালাল বাবুর নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

সেনহাটি-নিবাসী শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেন, এম্, এ, বি, এল্, মহাশয়ের নিকট আজ আমি হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। নানা কারণে,—বাহিরের ও ভিতরের নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আমি যখন এই গ্রন্থ সমাপ্ত ও প্রকাশিত করিবার বাসনা একপ্রকার ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তখন তিনিই আমাকে উৎসাহ দান করিয়া আমাকে রচনা-কার্য্যে পুনরায় ব্রতী করিয়াছিলেন; প্রকৃত পক্ষে তাঁহার আগ্রহ ব্যতীত এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইত কি না, সন্দেহের বিষয়।

যাঁহারা আমার এই কার্য্যে প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও আজ আমি নমস্কার করিতেছি। আমি তাঁহাদের নিকটেও ঋণী। তাঁহাদের প্রতিকূলতাচরণ আমাকে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার জন্য বারবার পীড়ন করিয়াছে—নতুবা হয়ত এ কার্য্যে আরও বিলম্ব হইত, এমন কি ইহা প্রকাশিত নাও হইতে পারিত। যাঁহারা বিরোধীর বেশে আমার বন্ধুতা করিয়াছেন তাঁহাদের আজ সর্ব্বান্তঃকরণে নমস্কার করিতেছি—তাঁহারা আজ প্রসন্ন হউন।

আমি পারস্য-ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা এ দুয়ের কোনটিতেই অভিজ্ঞ নহি। কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনচরিত রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া আমি মারখামের পারস্যের ইতিহাস (Markham's History of Persia) পাঠ করি। তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া পারস্যভাষাবিৎ পণ্ডিত, পাটনা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্, এ, (প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিভুক্) মহাশয়ের পরামর্শানুসারে আমি পারসিক সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে বাধ্য হই। হাফিজ, সাদী, ওমর খৈয়াম প্রভৃতির প্রধান প্রধান কাব্যের ইংরাজী অনুবাদ ব্যতীত আমি এডওয়ার্ড জি ব্রাউনের পারসিক সাহিত্যের ইতিহাস (Browne's Literary History of Persia), রেভারেণ্ড জে, রেণল্ডসের পারসিক কবিদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Reynold's Biographical Notices of Persian Poets) প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ

করি। বলা বাহুল্য, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর প্রসাদে আমার এই গ্রন্থগুলি অধ্যয়নের সুযোগ হইয়াছিল ; নতুবা কি করিতাম, বলিতে পারি না। বহুদিন পূর্ব্বে আমার ইচ্ছা ছিল, কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনীর নাম দিব, "বাঙলার হাফিজ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।" পরে দেখিলাম, তিনি সাদী ও অন্যান্য কবির যেরূপ প্রভাব লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে শুধু তাঁহাকে হাফিজ বলা চলে না। তিনি বহুর অনুপ্রাণনে অনুপ্রাণিত হইলেও, তাঁহার নিজের একটি স্বতন্ত্র স্থান আছে, অন্য কাহারও নাম-গৌরব তাঁহার অম্লান যশোরাশির মহিমা খর্ব্ব করিবে ; কাজেই পূর্ব্বের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল। মার্কিন-ঋষি এমার্সনের উক্তিও মনে হইতেছিল, "He is great who is what he is from nature and who never reminds us of others."

যাঁহারা অতুল প্রতিভাবলে স্বতঃই সকল সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও সকল বিষয়ে লব্ধানুপ্রবেশ, তাঁহাদের নিকট আমার কোনো দাবি নাই। সহৃদয় পাঠকও পদে পদে আমার অক্ষমতার পরিচয় পাইবেন। আমা অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে আমি শুধু সুখী হইতাম তাহা নয়,—আমার সংগৃহীত উপকরণ অম্লানবদনে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে আমি প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু এই অক্ষমকেই এই গুরুভার বহন করিতে হইল। পাঠক আমার অক্ষমতা ভুলিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিবার চেষ্টা করিবেন, ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ, তাহা হইলে সমুদয় শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব।

সেনহাটিতে প্রথমবার যখন প্রভাতের অরুণ-কিরণ উদ্ভিন্ন হইতে না হইতে ভৈরবের তীরে "বিকশিত কামিনীকুসুম তরুর" নিকটে দাঁড়াইয়া প্রথম নিঃশ্বাস গ্রহণ করিয়াছিলাম তখন অজ্ঞাতসারে একটা আনন্দের আবেগ আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল ; তীব্রতায় সে আনন্দ বেদনার মতনই অনুভব করিয়াছিলাম। ভাবিলাম, এই সেই কবির জন্মস্থান, শৈশবের ক্রীড়াভূমি! এখানকার বাতাসে তাঁহার নিঃশ্বাস মিশিয়া রহিয়াছে, এখানকার শ্মশানে তাঁহার নরদেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে! গতপূর্ব্ব বৎসরের ঝড়ে কবির বাসগৃহখানি ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। সেই ভিটার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মনে হইয়াছিল, যেন চতুঃপার্শ্বস্থ তরুলতা গভীর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার সেই নরনিকেতনের ধ্বংসাবশেষের প্রতি চাহিয়া আছে। তরুপল্লবে সঞ্চিত শিশিরবিন্দুগুলি দেখিয়া মনে হইয়াছিল, প্রকৃতিগত-

প্রাণ কৃষ্ণচন্দ্রের বিরহে প্রকৃতিদেবী যে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাই শীতল প্রভাতবায়ুস্পর্শে মুক্তাহাররূপে প্রতিভাত হইতেছে। আজ আবার এই প্রাবৃট-মধ্যাহ্নে তাঁহার জন্মভূমির আর এক নূতন ছবি দেখিতেছি। চারিদিকে শ্যামলতার একখানি অখণ্ড ছবি, তাহারি কোলে বর্ষাকালের ভৈরব দুকূল ছাপাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; পুষ্প-রিক্ত কামিনীফুলের ঝাড় পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছে। পল্লি-পথে পথিকের সাড়া পাইয়া হংসশ্রেণী চকিত হইয়া দ্রুত সরোবরের জলে অবগাহন করিতেছে। বাগানের বেড়ার ধারে ধারে নিবিড় শ্যামলতার স্তর ভেদ করিয়া সোণালি রঙের আনারসগুলি উঁকি মারিতেছে। এ ছবি যে দেখিবে, সেই মুগ্ধ হইবে। জয়দেবের নামে কেন্দুবিল্ব যেমন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, মাইকেল মধুসূদনের নামে সাগরদাঁড়ি যেমন অমরতা লাভ করিয়াছে, কৃষ্ণচন্দ্রের নামে সেনহাটি তেমনি অচিরকালমধ্যেই তীর্থপদবী লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রকৃতির নিষ্কলঙ্ক ছবি, কৃষ্ণচন্দ্রের এই পবিত্র জন্মভূমিতে বসিয়া যে গ্রন্থের রচনা আরম্ভ হইয়াছিল, আজ সেই তীর্থস্থানে বসিয়াই গ্রন্থরচনা সমাপ্ত করিতেছি। ইতি ২রা আষাঢ়, ১৩১৮।

সেনহাটি,
২রা আষাঢ়,
১৩১৮।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বংশ পরিচয়।

নরহরি দাশ কবীন্দ্র বিশ্বাস

রমানাথ দাশ কবিসার্ব্বভৌম — যদুনাথ দাশ তলাপত্র — বাণীনাথ দাশ কবিশেখর

কাশীনাথ দাশ কবিকণ্ঠভূষণ — কমলানাথ দাশ (কবি ডিম্ ডিম্) — মথুরানাথ দাশ কবিকর্ণপুর

রামচন্দ্র শিরোমণি — রামেশ্বর কবিমণি — বিশ্বেশ্বর দাশ — মহেশ্বর দাশ

রুদ্রদাস কণ্ঠরত্ন — কৃষ্ণদাস মজুমদার — মুন্সী নরোত্তম দাশ (কবীন্দ্র শেখর মজুমদার) — ১মা কন্যা — ২য়া কন্যা

রঘূত্তম মজুমদার (দত্তক) (অপুত্রক) — কাশীরাম দাশ (দত্তক) (অপুত্রক) — বিশ্বনাথ মজুমদার (দত্তক) — এক কন্যা

বৈদ্যনাথ — শিবনাথ — লক্ষ্মীনারায়ণ — অযোধ্যারাম — গোপিকৃষ্ণ (২য়া স্ত্রী কমলাসুন্দরী) — ৪ কন্যা

মাণিক্যচন্দ্র ওরফে মহেশচন্দ্র (২য়া স্ত্রী ব্রহ্মময়ী)

মুক্তকেশী — রামকালী — সারদাসুন্দরী — কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (স্ত্রী শ্রীমতী অমৃতময়ী গুপ্তা)

যোগেশচন্দ্র (২ বৎসরে মৃত্যু) — উমেশচন্দ্র — বিমলাসুন্দরী — কুসুমকুমারী — বিনোদিনী — নলিনীবালা

ইন্দুশেখর মজুমদার



কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবন-চরিত।

প্রথম অধ্যায়।

জীবনের প্রসার।

হাফিজ, ওমর খৈয়াম পারস্য দেশের পাগল কবি, কাউপার ইংলণ্ডের পাগল কবি। বাঙ্‌লার পাগল কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। পাগল জগতে অসাধ্য সাধন করিয়াছে। পাগল ভক্তরূপে, বক্তারূপে, রাষ্ট্রীয় নেতারূপে, সমাজ ও ধর্ম্ম-সংস্কারকরূপে, নারীসুহৃদ্‌রূপে, সাহিত্যিক ও কবিরূপে, যোদ্ধা ও কর্ম্মিরূপে, যুগে যুগে, দেশে দেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সাধারণ মানুষ অসাধারণ হইলেই জগৎ তাহাকে পাগল বলে। এ জগতের ইতিহাস কেবল পাগলদিগের কাহিনী লইয়াই রচিত। যাহারা সুখ ছাড়িয়া দুঃখকে বরণ করিয়া লয়, তাহাদেরই পদরজে পৃথিবী পবিত্র হয়। সুখের কাঙাল 'সুখ' 'সুখ' করিয়া ভিক্ষা-ঝুলি পূর্ণ করিবার জন্য অহোরাত্র ক্রন্দন করিতেছে,

কিন্তু সে হতভাগ্যদের কথা কেহ জিজ্ঞাসাও করে না। জগতের চক্ষে ও জগতের পক্ষে তাহারা মৃত। আত্মসুখ যাহাদের চির আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী, মৃত্যু তাঁহাদের একমাত্র পুরস্কার। এ জগতে কত রাজা, ভোগী, বিষয়ী, বিলাসী অতীতের গর্ভে চিরসমাধি লাভ করিয়াছে, কিন্তু দুঃখের পশরা মাথায় বহিয়া কেহ মরণ লাভ করে নাই। যেন দুঃখই "অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।"

এ জগতে পাগলদিগকে অনেক দুঃখ সহিতে হইয়াছে। কিন্তু এ দুঃখ তাঁহারা পরের জন্যই সহিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা কেহই দুঃখবাদী ছিলেন না। পরের সুখের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাঁহারা দুঃখ বহন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সুখবাদী। যে কবি নিজে অবিমিশ্র দুঃখের মধ্যে থাকিয়াও আনন্দের উৎসস্বরূপ কাব্য জগতকে দান করিয়া যান, তিনিও সুখবাদী। জগৎ তাঁহাকে যত ভাবে— যত আকারেই দুঃখবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করুক না কেন, তিনি সুখবাদী না হইয়াই পারেন না। কবি কৃষ্ণচন্দ্রের বিরুদ্ধে একটি বৃহৎ অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি দুঃখবাদী ছিলেন। তাঁহার বহিঃপ্রকৃতি দুঃখবাদীর অনুরূপ ছিল এ কথা সত্য, কিন্তু তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতি যে একান্তই সুখবাদী ছিল, তাহার পরিচয় আমরা তাঁহার কাব্যে প্রচুর পরিমাণে পাইয়াছি। যথাস্থানে সে বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।

দুঃখবাদ সম্পর্কে একটি কথা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। যাহারা এ জগতে উপভোগ্য, আনন্দদায়ক, আত্মার বিকাশের সহায়স্বরূপ কিছু দেখিতে পায় না, এবং সেই জন্যই দুঃখকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, তাহারাই যথার্থ দুঃখবাদী। যাহাদের কর্ণে আশার বাণী কখনো পৌঁছায় না, তাহাদের জীবনের উৎস শুকাইয়া গিয়াছে ;

তাহারাই যথার্থ দুঃখবাদী। প্রভাতের সুকুমার সৌন্দর্য্য, সন্ধ্যার রমণীয় শোভা, অন্ধকার যামিনীর কবরী-শোভন তারার মালা, সিঁথি-স্বরূপ ছায়াপথ, শুক্লা যামিনীর অনন্ত-কৌমুদী-ধারা, নিদাঘের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস, বিরহিনী বর্ষার নিশীথ-ক্রন্দন, শরতের স্নিগ্ধ হাস্য, হেমন্তের কুহেলি-ওড়না, শীতের অনন্ত শিহরণ, বসন্তের পুলক-হিল্লোল যাহার কাছে অর্থবিহীন প্রাকৃতিক ব্যাপার মাত্র, যাহার চক্ষে মায়ের স্নেহ, সতীর প্রেম, শিশুর স্বর্গীয় হাস্য, প্রেমিকের আত্মবলিদান, ভক্তের আত্মনিবেদন, মানবপ্রকৃতির খেয়াল মাত্র, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত দুঃখবাদী। এরূপ লোককে দুঃখবাদী না বলিয়া এমন কি কবন্ধ বলা যাইতে পারে। এই বিরাট জগদ্ব্যাপারের মধ্যে থাকিয়াও যাহারা নির্লিপ্ত, কোনও সুখদুঃখের তরঙ্গই যাহাদের কাছে পৌঁছায় না, তাহারা প্রকৃতপক্ষে জীবন্মৃত। এই দিক্ দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব, কবি কৃষ্ণচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ কেহ কেহ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই ভিত্তিহীন, কোন যুক্তির উপরই সে অভিযোগ দাঁড়াইতে পারে না।

কাব্যের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র যেটুকু অভিব্যক্ত হইয়াছেন, যদি তাঁহার কবি-জীবনীটি ঠিক ততটুকু হইত, তাহা হইলে তাঁহার সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার থাকিত না। কবিতা রচনা করা অপেক্ষা কবি-জীবন যাপন করা অনেক কঠিন কাজ। এদেশে যাঁহারা কবিতা রচনার সঙ্গে কবি-জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। এই শ্রেণীর অন্তর্গত একজন কবি বিহারিলাল। "ভাবে ভোলা খোলা প্রাণ" বিহারিলাল সরলতায় কৃষ্ণচন্দ্রেরই অনুরূপ ছিলেন; কিন্তু একটা তন্ময়তা কৃষ্ণচন্দ্রকে সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত, তিনি তাহার ঊর্দ্ধে কোনোমতেই উঠিতে পারিতেন না;

বিহারিলালের তন্ময়তা মাঝে মাঝে টুটিয়া যাইত, সেই অবসরে তিনি হাসি গল্প গানকে প্রশ্রয় দিতেন ; বিশ্বের লোক জুটাইয়া সকলের সহিত গলাগলি মাখামাখি করিয়া, আপনাকে বিলাইয়া দিয়া তিনি পরম আনন্দ লাভ করিতেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের তন্ময়তা কেবল একাকীত্বই সৃষ্টি করিত ; ঊর্ণনাভ যেমন আপনার মনে কেবলই জাল বোনে, কৃষ্ণচন্দ্র তেমনি সর্ব্বদা একটা কি বুনিতেন, তাহা আর কেহ বুঝিতে পারিত না। তাঁহার এ বুনন কার্য্য যেন কিছুতেই শেষ হইতে চাহিত না। সময়ে সময়ে বিহারিলালেরও এরূপ হইত। সন্ধ্যারাত্রে তাম্রকূট সাজিয়া কলিকাটি ছাদের আলিসায় রাখিয়া তাহাকে ধরাইবার মানসে অপেক্ষা করিতে করিতে তিনি কখন্ উন্মনা হইয়া যাইতেন, তাহার ঠিকানাও থাকিত না ; কখন্ মনে মনে টানা-পোড়েন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, তাহা তিনি জানিতেও পারিতেন না। নিশান্ত বাতাসের স্পর্শে, বিহঙ্গের প্রথম প্রভাতী সঙ্গীতে, পূর্ব্বাকাশে উদয়গিরির অন্তরাল হইতে রক্তিমাভ বালসূর্য্যের ঈষৎ আভাসে তাঁহার সে ইন্দ্রজাল ছিঁড়িয়া গিয়াছে, এরূপ কাহিনী তাঁহার জীবনে বিরল নহে। বীচিমালা-বিক্ষোভিত ভৈরবের তীরে স্খলিত কামিনীফুলের দলে খচিত মৃত্তিকাসনে বসিয়া কবি কৃষ্ণচন্দ্রও যে কত মধুর ঊষা ও কত করুণ সন্ধ্যা কোন্ অজ্ঞাতের ধ্যানে কাটাইয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে ?

বাঙ্‌লা দেশ অন্নের কাঙাল বটে, কিন্তু কাব্যের কাঙাল কোনদিনই নহে। যে দেশে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব, মুকুন্দরাম, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, ঈশ্বরগুপ্ত, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথের মত কবির আবির্ভাব হইয়াছে, সে দেশ কাব্যের কাঙাল হইতেই পারে না। বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে

বাঙ্লা দেশে কাব্য সাহিত্যের যে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাহা এ দেশ কেন, জগতের যে কোন সভ্য দেশের পক্ষে গৌরবের বিষয় হইতে পারিত। কিন্তু এই ভাস্বর কবিসমাজে কৃষ্ণচন্দ্রের স্থান আছে কি না এবং থাকিলে সে স্থান কোথায়, তাহা জানিবার বিষয় বটে।

অনেক কবির জীবনে কবিপ্রতিভার সঙ্গে মনুষ্যত্বের বিকাশ একত্রে ঘটিয়া উঠে নাই। ইংরাজ-কবি বায়রণ ও আমাদের স্বদেশীয় কবি মধুসূদন অতুল-কবিপ্রতিভাসম্পন্ন লোক হইয়াও চরিত্র-গৌরবে উন্নত ছিলেন না। উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল ভাবেই তাঁহারা জীবন ক্ষয় করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র যদি কবি না হইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার জীবনে এমন একটা অসাধারণত্ব, তাঁহার চরিত্রে এমন একটা বলবত্তা ছিল, যাহার জন্য তাঁহাকে লোকে জানিতে চাহিত। তাঁহার মত স্বচ্ছপ্রাণ, সত্যনিষ্ঠ, আত্মমর্য্যাদাবিশিষ্ট, স্বাধীনচেতা, কর্ত্তব্য-পরায়ণ মানুষ আজকালকার দিনে দুর্লভ বলিলে হয়। তাঁহার মত বিশ্বাসে অটল, কর্ম্মে ধীর, ধর্ম্মে অনাড়ম্বর লোক বাঙ্লা দেশে বেশী জন্মিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারি না। তাঁহার সংস্পর্শে যে একদিনের জন্য আসিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, একটা জীবন্ত মানুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে,—তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে অন্যের নীচতা লজ্জায় মারয়া গিয়াছে। যেখানে তাহাকে দেখিবার কেহ নাই, সেখানেও তিনি প্রাণপণে আপনার কাছে খাঁটি থাকিবার জন্য সচেষ্ট, যেখানে তাঁহাকে জগৎ অনাবশ্যক যশ, অতিরিক্ত অর্থ দিতে চাহিয়াছে, সেই খানেই তিনি তাহা দ্বিধাদ্বন্দ্ববিহীন চিত্তে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; এই খানে তাঁহার মনুষ্যত্ব, মহত্ব ও প্রকৃত কবিজীবনের অভিব্যক্তি। তাই বলিতেছিলাম, তিনি কবিতা না লিখিলেও তাঁহার জীবন-চরিত লিখিবার আরো উপকরণ থাকিত।

মানুষের পক্ষে জগদ্বিজয়ী হওয়া সহজ, কিন্তু আত্মজয়ী, আত্ম-প্রত্যয়ী হওয়া বড় কঠিন। আমাদের গৌরবের বিষয় এই যে কৃষ্ণচন্দ্র আত্মজিৎ ও আত্মপ্রত্যয়ী পুরুষ ছিলেন। অনন্যসাধারণ মহাপুরুষগণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে সাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া জগতের চক্ষে পাগল প্রতিপন্ন হইয়াছেন, কবি কৃষ্ণচন্দ্রও জগতের কাছে না হউন, বাঙালীর কাছে একদিন পাগলরূপে দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহার হাফিজই তাঁহাকে পাগল করিয়াছিল। বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্রে মহাপুরুষগণ যে আভ্যন্তরীণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, অল্প পরিসরের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র সেই শক্তিরই পরিচয় দিয়াছেন, এই মাত্র প্রভেদ। ব্যাপ্তির দ্বারা মহত্বের বিচার হইতে পারে না, আমরা এ ক্ষেত্রে সে চেষ্টায় প্রবৃত্তও হইব না।

একটি মানুষকে ভালো করিয়া জানিতে হইলে, তাহার জীবনের আদ্যন্ত দেখিতে হয়। পৃথিবীর হিসাবে আদি জন্ম, অন্ত মৃত্যু। কিন্তু একটি মানুষের জন্মের কত পূর্ব্ব হইতেই অজ্ঞাতভাবে একটা বৃহৎ আয়োজন চলিতে থাকে, তাহা আমাদের জড় চক্ষু দেখিতে পায় না। আবার এক জনের মৃত্যুর পরই তাহার সকলি নিঃশেষিত হইয়া যায় না। জড়দেহ নষ্ট হইলেও মানুষের সুকৃতি দুষ্কৃতি জগতে কাজ করিতে থাকে। মানুষের জীবন জন্মমুহূর্ত্ত হইতে মৃত্যুমুহূর্ত্তের মধ্যেই যদি আবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে পশু ও মানবজীবনে কোনো পার্থক্য থাকিত না। একটি সামান্য মানুষকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য তাহার জন্মের পূর্ব্ব হইতেই যে একটা বিশ্বব্যাপী আয়োজন চলিতে থাকে, তাহার কি একটা মূল্য নাই? পিতামহদের গৌরবকাহিনীর ঐশ্বর্য্যভার মাথায় বহন করিয়া, পিতৃপুরুষদিগের পাপপুণ্যের উত্তরাধিকারিরূপে যে আসে, তাহার আগমনের জন্য যুগযুগান্তর ধরিয়া

আয়োজন চলিতে থাকে। সুতরাং তাহাকে জানিতে হইলে সে কি উপাদানে গঠিত, তাহা বুঝিতে হইবে। তাহার প্রকৃত পরিচয় শুধু তাহার জীবিতকালের মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে না। তাহার মৃত্যুর পরও তাহার জীবন দেখিতে হইবে। তাহা না হইলে তাহাকে সমগ্রভাবে, প্রকৃতভাবে দেখা হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র একবার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "কেহ যেন আমার জীবন-চরিত লিখিবার প্রয়াস না করে। যদি কেহ লেখে, তবে যেন সত্য কথাই লেখে, আর আমার মৃত্যুর পর বারো বৎসরের পূর্ব্বে যেন কেহ এ কাজে হস্তক্ষেপ না করে।" বঙ্কিম জ্ঞানে ও দূরদর্শিতায় ঋষি-কল্প ব্যক্তি ছিলেন। এই 'বারো বৎসর পরে' জীবনী লিখিতে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার দৈহিক মৃত্যুর পর বারো বৎসর তিনি বঙ্গসমাজে কি কাজ করেন, তাহা না দেখিয়া জীবনচরিত লেখা সঙ্গত হইবে না, লিখিলে হয় পক্ষপাত-দোষ, অথবা অবিচার হইবার সম্ভাবনা। দেহের মৃত্যুর পরও মানুষ বাঁচিয়া থাকে, একথা তত্ত্বজ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্র খুব ভালো করিয়াই জানিতেন, সেই জন্যই এই কথা বলিয়াছিলেন।

কবি কৃষ্ণচন্দ্রকে জানিতে হইলে তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার দেশ, গ্রাম ও সমাজের অবস্থা কি ছিল, তাহা জানা আবশ্যক। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি কি লইয়া এ জগতে আসিয়াছিলেন, তাহাও দেখিতে হইবে। তাঁহার জীবিতকালে তিনি কি ছিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে যেমন তাঁহার জন্মের পূর্ব্ব-ইতিহাস জানা অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়, তেমনি তাঁহার দেহত্যাগের পর তিনি কি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাও বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। এই দুইয়ের আলোচনার দ্বারাই তাঁহার জীবনের গভীর অর্থ আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সেনহাটির পূর্ব্বকথা।

কবি কৃষ্ণচন্দ্রের বাল্যের পার্শী শিক্ষাদাতা, অধুনা কাশীবাসী, সুপ্রাচীন শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় বর্ত্তমান লেখকের বিশেষ অনুরোধে স্বয়ং দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়াও অন্যের সাহায্যে সেনহাটি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এখানে তাহার সার সঙ্কলন প্রদত্ত হইল।

"সেনহাটি গ্রাম ভৈরবনদের তটে অবস্থিত। পূর্ব্বে উহা জেলা যশোহরের অধীন ছিল, পরে খুলনার অন্তর্গত হইয়াছে। এ গ্রামখানি কতকালের পুরাতন, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। বৈদ্যজাতির আদিবাসস্থান রাঢ়দেশ হইতে কতক বৈদ্য মহাশয়রা বঙ্গদেশে আসিয়া প্রথমেই সেনহাটি চন্দনীমহল্ল গ্রামে বসতি করিয়াছিলেন। এই জন্য এবং প্রধান প্রধান কুলীন বৈদ্য বসতি করায় বঙ্গীয় বৈদ্যগণের সাতাইশটি সমাজ মধ্যে উক্ত গ্রাম আদিসমাজ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। রাঢ়দেশ হইতে বৈদ্য মহাশয়রা কতকাল বঙ্গদেশে আসিয়াছেন, বৈদ্য মহাশয়দিগের প্রাচীন কুলগ্রন্থে তাহার নির্দ্দেশ নাই এবং সর্ব্ববিদ্যা-ঠাকুরদিগের পূর্ব্বাধিকারে সিদ্ধপুরুষ সর্ব্বানন্দ ভট্টাচার্য্য ঠাকুর মহাশয় স্বীয় শিষ্য দাস রাজার প্রতি অভিসম্পাত প্রদান পূর্ব্বক মেহার হইতে বহুকাল পূর্ব্বে বঙ্গদেশে আসিয়া প্রথমেই সেনহাটি গ্রামে বসতি করিয়াছিলেন। সে কতকালের কথা, তাহার ঠিকানা করা যায় না। সর্ব্বানন্দতরঙ্গিণী গ্রন্থে উক্ত কালের কোন নির্দ্ধারণ



ভক্ত গিরিশ চন্দ্র সেন।

হয় নাই। বৈদ্যগণ রাঢ়দেশ হইতে এবং মহাত্মা সর্ব্বানন্দ ঠাকুর মহাশয় মেহার হইতে প্রথমে যে সময়ে সেনহাটিতে আগমন করিয়াছিলেন, সে সময়ের পূর্ব্ব হইতে সেনহাটি গ্রামে অবশ্য লোকালয় ছিল, নতুবা তাঁহারা কদাচ বসতি করিতেন না। তাহার কত পূর্ব্বে এই লোকালয় বা পল্লীর সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা উক্ত মহাত্মাগণের আগমন দ্বারাও স্থির হইতে পারে না। উক্ত গ্রামে বসতির যেরূপ সুশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ সুশৃঙ্খলা অন্য কোন পল্লীগ্রামে দৃষ্ট হয় না। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও ভদ্র কায়স্থ মহাশয়দিগের বংশের উল্লেখে তাঁহাদের বাসপল্লীর নামকরণ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগের মধ্যে সর্ব্ববিদ্যাপাড়া, কাজড়ীপাড়া, সিদ্ধান্তপাড়া, শাণ্ডিল্যপাড়া, হরপাড়া, মুখুজ্যেপাড়া, কোটালীপাড়া নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এক বংশের লোকের অন্য বংশের পাড়াতে বসতি দেখা যায় না। তবে কুলীন ব্রাহ্মণসন্তানেরা বিবাহ-সম্বন্ধ আদিতে নানা পাড়ার স্থানে স্থানে বসতি করিতেছেন; ঐ সকল পাড়া ব্যতীত বৈদ্য মহাশয়দিগের বাস-পল্লী পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট আছে। এক এক বংশের বৈদ্য মহাশয়রা এক এক স্থানে বসতি করিতেছেন; সেই সেই বংশের উল্লেখে সেই সেই পাড়ার নামকরণ হইয়াছে। যথা ধন্বন্তরিপাড়া, অরবিন্দপাড়া, হিঙ্গুপাড়া, গণপাড়া ইত্যাদি। আবার ধন্বন্তরিপাড়ার মধ্যে মুন্সীপাড়া, বক্সীপাড়া। অরবিন্দপাড়ার মধ্যে দাশপাড়া, রায় পাড়া, মজুমদারপাড়া নামে বিখ্যাত আছে।

সেনহাটি গ্রামে বহুপূর্ব্ব হইতে সংস্কৃত ভাষার বহুল চর্চ্চা ছিল। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য অনেক অধ্যাপকের বাড়ীতে টোল অর্থাৎ সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ছিল। দেশ বিদেশ হইতে ছাত্রগণ আসিয়া ঐ সকল টোলে অধ্যয়ন করিত। বৈদ্য মহাশয়দিগের টোলে ব্যাকরণ ও সাহিত্য

অলঙ্কারাদির এবং ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগের টোলে ন্যায় ও স্মৃতির অধ্যাপনা হইত। ইহা যে সময়ের কথা, তখন আদালত ফৌজদারী আদি গভর্ণমেণ্টে. সমুদয় কার্য্যালয়ে পারস্য ভাষা প্রচলিত ছিল। এইজন্য সেনহাটির কতক বৈদ্য ও কুলীন ব্রাহ্মণ ও ভদ্র কায়স্থদিগের সন্তান মুন্সী সাহেবদিগের মকৃতবে পারস্য ভাষা পড়িয়া নানারূপ বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন। উন্নতির পর অবনতি অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃতিক নিয়ম। মনুষ্য, পশু পক্ষী ও গ্রামনদ্যাদি সমুদয় চেতন ও অচেতন পদার্থই এই নিয়মের অধীন। যৌবনকাল গত হইলে অকর্ম্মণ্য প্রাচীন দশা উপস্থিত হয়। সেনহাটি সম্বন্ধেও এ নিয়ম বিলক্ষণ খাটে। সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণ ক্রমে ক্রমে কালকবলিত হইলে, আধুনিক ইংরাজী ভাষা শিক্ষার স্রোত আস্তে আস্তে বহিতে থাকে। সংস্কৃত ভাষা'শিক্ষার স্রোত মন্দীভূত হইতে আরম্ভ করার পরে এবং ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে সেনহাটির গ্রাম্য গুরুমহাশয়দিগের হস্তে বালকদিগের শিক্ষার ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। গ্রামের মধ্যে প্রথমতঃ ভবানী সরকার, তৎপরে ঈশ্বর সরকার, তাহার পর রামকুমার সরকার প্রভৃতি অনেক গুরুমহাশয় শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে রামকুমার সরকার গুরুর বিবরণ আশ্চর্য্যজনক। সে পূর্ব্বে খানসামাগিরির কর্ম্ম করিত, কালক্রমে শিক্ষাগুরু হইয়া উঠিল। সে বাঙ্গালা ভাষায় গান ও কবিতা উত্তমরূপে রচনা করিতে পারিত। গ্রামের মধ্যে যখন যে ঘটনা হইত, তাহা উপলক্ষ করিয়া কৌতুকজনক গান কি কবিতা রচনা করিত। বালকগণ পথে ঘাটে ঐ সকল গান গায়িয়া ও কবিতা পাঠ করিয়া বেড়াইত। প্রবীণ লোকেরা তাহা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেন না। রামকুমারের রচিত গানগুলি যদি কেহ লিখিয়া

রাখিত, তবে কৌতুকজনক একখানি গানের পুস্তক হইত। সে সময়ে গ্রামের মধ্যে কোনও ডাক্তার ছিলেন না, কবিরাজ মহাশয়রা চিকিৎসা করিতেন। তাঁহারা প্রথমে কুইনাইন দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ করিলে বিজ্ঞ ও ইতর কবিরাজদিগের সম্বন্ধে রামকুমার যে একটি গান রচনা করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে এখনও হাস্য সম্বরণ করা যায় না। বাহুল্যভয়ে ঐ গানটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল না। গ্রাম্য গুরুদিগের পাঠশালায় সাধারণত ক-খ ও ফলা ও পরে শুভঙ্করী অঙ্ক শিক্ষা দেওয়া হইত, এবং নামৃতা পড়ান যাইত। বালকগণ দুইদিকে দুইদলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া একদলে উচ্চৈঃস্বরে নামৃতা পড়াইত, অন্য দলে উচ্চৈঃস্বরে তাহা পড়িত। মধ্যস্থলে গুরুমহাশয় বেত্র হস্তে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। যে বালকের দল নামৃতা পড়াইত, তাহাদিগেরই বিপদের আশঙ্কা অধিক ছিল, অশুদ্ধ পড়াইলে গুরুমহাশয়ের হস্তস্থিত কঠিন বেত সজোরে তাহাদের পৃষ্ঠদেশ আলিঙ্গন করিত। ব্রণ অস্ত্রকালে ডাক্তারের অস্ত্র দেখিয়া রোগীরা যেরূপ ভয় করিয়া থাকে, গুরুমহাশয়ের হস্তস্থিত বেত বালকদিগের পক্ষে তদপেক্ষা অধিক ভয়ানক হইত। এই সময়ের পর সার্কেল নিয়মে স্কুল আরম্ভ হইয়াছিল। * * * গ্রাম্য গুরুদিগের শিক্ষা দেওয়ার কালে সেনহাটি গ্রামের অরবিন্দপাড়ার মধ্যে মজুমদার পাড়ায় কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাণিক্যচন্দ্র মজুমদার মহাশয় অধিক সম্পত্তিশালী লোক ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার সাধুচরিত্রবলে গ্রামের মধ্যে একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। মাণিক্যচন্দ্রের পিতা কীর্ত্তিপাশা গ্রামের মজুমদারদিগের গৃহে বিবাহ করিয়া কুলমর্য্যাদাস্বরূপে কিছু ভূসম্পত্তি বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তাহার উপস্বত্ব দ্বারা প্রথমে তিনি, তদভাবে

মাণিক্যচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সংসার প্রতিপালন করিতেন। সে সময়ে সেনহাটি গ্রামে কুলীন বৈদ্য মহাশয়দিগের মধ্যে অল্পসংখ্য লোক বিষয় কর্ম্ম করিতেন, অধিক লোকের পক্ষে কুলমর্য্যাদাই জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় ছিল। পূর্ব্ব ও উত্তর দেশের বৈদ্য মহাশয়দিগের ঘরে বিবাহ আদি ক্রিয়া করিয়া কুলমর্য্যাদা-স্বরূপ যে ভূমি ও নগদ অর্থ পাইতেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা অক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তখন এই দেশস্থ বৈদ্য মহাশয়দিগের নিকট কুলীনদিগের যথেষ্ট সম্মান ছিল। উক্ত দেশস্থ বৈদ্য মহাশয়গণ কুলক্রিয়াকে দেবক্রিয়ার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। তখন আহার্য্য দ্রব্য ও পরিধেয় বস্ত্রাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইত, অল্প অর্থের দ্বারাই সুখস্বচ্ছন্দে ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হইত। লোকের মনে বিলাসিতা ছিল না ও বিলাতী বিলাসের দ্রব্য পাওয়া যাইত না। সে কাল গিয়াছে। এইক্ষণকার লোকে নানা উপায়ে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও সেরূপ সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে না। অধিক অর্থ উপায় করিলে কি হইবে? খাদ্যদ্রব্য ও পরিধেয় এত দুর্ম্মূল্য হইয়াছে যে, বহু অর্থব্যয় করিয়াও এক এক পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতে পরিবারের কর্ত্তার প্রাণান্ত হইয়া উঠে। তাহার উপর নিত্য নূতন বিলাসের দ্রব্য উপস্থিত ও ব্যবহৃত হওয়ায়, তাহা ক্রয় করিতে সংসারের কর্ত্তাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। কৃষ্ণচন্দ্রের শৈশবকালে পিতা মাণিক্যচন্দ্র তাঁহার এক কন্যাকে মৃত দুর্গাদাস সেন মহাশয়ের সহিত বিবাহ দেওয়াতে ঐ কন্যা পতিগৃহে বাস করিত। মাণিক্যচন্দ্র একমাত্র শিশুপুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে ও স্বীয় বনিতাকে বর্ত্তমান রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের মাতা শিশুপুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিপালন ও বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কীর্ত্তিপাশার জমিদারদিগের দত্ত বৃত্তিভূমির যে কিছু উপস্বত্ব পাওয়া

যাইত, তদ্দ্বারা তিনি কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রতিপালন করিতেন। কৃষ্ণচন্দ্র সে সময়ের নিয়মমতে গ্রাম্য গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। কতক দিবস তথায় শিক্ষা করিয়া তাঁহার জ্ঞাতি গৌরচন্দ্র দাস মহাশয়ের সঙ্গে ঢাকা নগরে গমন করিলেন। উক্ত দাস মহাশয় তখন ঢাকা জজ আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন।"

ইহার পর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় আরও অনেক কথা লিখিয়াছেন, পরে তাহার উল্লেখ করা যাইবে। সেনহাটির পূর্ব্ব-বিবরণে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে সেনহাটি গ্রাম ও সমাজ সম্বন্ধে মোটামুটি বেশ একটি ধারণা করিতে পারা যায়।

সেনহাটি গ্রাম যে অতি পুরাতন, তাহার অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। সেনহাটির বাজার হইতে প্রায় এক পোয়া পথ উত্তরে নিমাই রায়ের বাটীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। কথিত আছে, সেনহাটির বাজারও নিমাই রায় কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। নিমাই মুসলমানদিগের অধিকারকালে রাণী ভবানীর অধীনে মোক্তারের কাজ করিতেন। সেনহাটিতে তাঁহার একখানি গাঁতি ছিল। এখন আর সে সম্পত্তির কিছুই নাই। নিমাই রায়ের বাটীর ভগ্নাবশেষ দেখিলে মনে হয়, উহা বৃহৎ না হইলেও এক সময়ে অতি সুন্দর ছিল। নিমাই রায়ের বাজারে একটি সুপ্রাচীন কালী মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি বৎসর সরস্বতী পূজা ও পৌষ সংক্রান্তির দিন এই স্থানে মহা সমারোহ হইত। গ্রামের শিক্ষিত সম্প্রদায় সেখানে সম্মিলিত হইয়া স্বীয় স্বীয় বিদ্যার পরিচয় দিতেন। সংস্কৃত ও পারস্য এই উভয় ভাষারই পরীক্ষা হইত; কারণ, তখন এই দুই সাহিত্যের চর্চ্চাই বিশেষ সুপ্রচলিত ছিল। সে সময়ে এই প্রতিযোগিতা-সভার একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। কৈশোরে কৃষ্ণচন্দ্রকেও এই মন্দিরপ্রাঙ্গণে বহুবার

বিদ্যাপরীক্ষা দিতে দেখা গিয়াছে। যশোহরের রাজা শ্রীকান্ত রায় কর্ত্তৃক এই মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল। অনুমান ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি উক্ত মন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের মালিক ছিলেন। রাজা রাজবল্লভ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দুইটি জীর্ণ মন্দির এখনো সেনহাটিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

খাঞ্জে আলির বিখ্যাত সড়ক সেনহাটি গ্রামের উপর দিয়া গিয়াছে। এই পথটি ভৈরবের ধারে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে প্রসারিত। সেনহাটির বাজার এই পথেরই উপরে অবস্থিত। পূর্ব্বে সেনহাটির নিজস্ব কতকগুলি ব্যবসায়ের সামগ্রী ছিল; উহার বাজার ব্যবসায়ের একটি কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। দূরতর স্থানের লোকও ব্যবসায় সম্পর্কে অনেক সময় সেখানে যাতায়াত করিত। সেনহাটির চিনির ব্যবসায় পুরাতন হইলেও এখনও উঠিয়া যায় নাই। *

বঙ্গদেশে যখন প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন উপস্থিত হয় তখন সেনহাটি সে আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল। যশোহর জেলার (তখনও খুলনা স্বতন্ত্র জেলা হয় নাই) বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম মাত্রেই সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ একটি করিয়া ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। ইংরাজিশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই ব্রাহ্মসমাজে যাওয়ার পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাদিগকে যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। শুনা যায় সময়ে সময়ে বিপক্ষদলের অত্যাচারের ভয়ে তাঁহাদিগকে অর্গলবদ্ধ গৃহে উপাসনা করিতে হইত। কৃষ্ণচন্দ্র এই ব্রাহ্ম প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই; যথাস্থানে আমরা তাহার উল্লেখ করিব।

সুরাপান দেশের মধ্যে তখন সুপ্রচলিত ছিল। দুই একজন ছাড়া সুরার আদর করিতেন না, এমন লোক প্রায় দেখা যাইত না।

* Vide Westland's Report on Jessore, 1871 and 1874.

কি গৃহে কি সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে, সর্ব্বত্রই সুরার আধিপত্য সমান ছিল। সুরার প্রতি পূর্ব্বের সে সমাদর এখনও নিতান্ত সূক্ষ্ম আকারে সেনহাটিতে বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণচন্দ্রের জনক জননী উভয়েরই ধর্ম্মে একান্ত নিষ্ঠা ছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্মানুরাগের কথা এখনও সেনহাটি গ্রামে প্রবাদবাক্যস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। কথিত আছে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে নরহরি দাশ মেহার নামক স্থানে বহু তপস্যার ফলে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। উক্ত নরহরি দাশের স্ত্রীও ধর্ম্মে অনুরাগিনী ছিলেন। কথিত আছে তিনিও গৃহে সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন। ইঁহাদের দুই জনের প্রাপ্ত মন্ত্র ও পূজার নিয়মে কিছু পার্থক্য ছিল, সেই জন্য ঐ বংশের স্ত্রী ও পুরুষগণ মন্ত্র গ্রহণের সময় পৃথক্ ভাবে মন্ত্র গ্রহণ করেন। দুর্গোৎসবে অন্যান্য বৈদ্যদিগের পূজার নিয়ম হইতে অরবিন্দবংশীয়দিগের নিয়ম যে কিছু পৃথক্ তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের সকল অনুষ্ঠানেই অদ্যাপি তান্ত্রিকতার প্রভাব বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। দেশ ও সমাজের নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দারিদ্র্য তাঁহার সহোদর ও সামাজিক দুরবস্থা তাঁহার বিমাতার স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু সুখের বিষয় তিনি এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সাধু জনকের গৃহে ও সাধ্বী জননীর ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

—ঃ*ঃ——

তৃতীয় অধ্যায়।

বাল্যবিবরণ।

কৃষ্ণচন্দ্রের বাল্যকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না। ইহার প্রধান কারণ তিনি নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিয়া যান নাই। "রা, সের ইতিবৃত্ত" নামক গ্রন্থে তিনি আত্মকাহিনী কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আত্মদোষ কীর্ত্তন বা জীবনের পাপ স্বীকার যে গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহাকে কোনো ব্যক্তির আত্মচরিত বলা যাইতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ এই যে, যাঁহারা তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ, অর্থাৎ যাঁহারা তাঁহার জন্মকালে বয়ঃপ্রাপ্ত ছিলেন এবং যাঁহাদের পক্ষে কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম ও বাল্যবিবরণ স্মরণ থাকা সম্ভবপর হইত তাঁহারা প্রায় সকলেই পরলোকগত। দুই একজন যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নাম উল্লেখ করা গিয়াছে। আর কেহ আছেন কি না জানিনা, না থাকিবার সম্ভাবনাই অধিক। এ ক্ষেত্রে মজুমদার-কবির উক্তিই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। নিজের সম্বন্ধে তিনি লোককে কিছু জানাইতে চাহিতেন না। ঘটনাক্রমে যশোহর হইতে এক ব্যক্তির পত্রের উত্তরে তিনি নিজের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিয়াছিলেন; সেই পত্রখানি আমাদের হস্তগত হওয়ায় আমরা উহা অবিকল উদ্ধৃত করিতে পারিলাম।

শ্রীদুর্গা

পরম কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলাম। আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা আছে ইহা তোমার নিতান্ত মঙ্গল লক্ষণ। পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। আমার পিতার নাম মাণিক্যচন্দ্র মজুমদার। আমার জন্মস্থান সেনহাটী। ১২৪৪।৪৫ সনে জ্যৈষ্ঠমাসে আমার জন্ম। ছেলেবেলায় আমার গুপ্তনাম রামচন্দ্র দাস ছিল। দাস গুপ্ত আমাদের বংশোপাধি। আমি ভাল আছি, নিজ মঙ্গল লিখিবা। ইতি

আ

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

পত্রের ভিতরে কোন তারিখ নাই; বাহিরে যশোহরের শীল-মোহরে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখ অঙ্কিত আছে।*

উদ্ধৃত পত্রখানি হইতে জানা যাইতেছে যে যখন পত্রখানি লিখিত হয় তখন প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছিল; ১২৪৪।৪৫ বঙ্গাব্দে সেনহাটি গ্রামে তাঁহার জন্ম হয় এবং তাঁহার গুপ্ত নাম ছিল রামচন্দ্র দাস। তাঁহার আত্মচরিতের নাম "রা, সের ইতিবৃত্ত" হইবার কারণও এই নাম হইতে বুঝিতে পারা যায়। এই গুপ্ত নামের প্রথম ও শেষ অক্ষর লইলে 'রা, স' হয়, সুতরাং ইহা হইতেই যে 'রা, সের ইতিবৃত্তের' উৎপত্তি তাহা বুঝিতে অধিক বিলম্ব হয় না। দাশ গুপ্ত কৃষ্ণচন্দ্রের বংশোপাধি ছিল। বলা বাহুল্য, 'মজুমদার' উপাধি নবাব সরকার হইতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে একজন লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই উপাধিই বংশানুক্রমে চলিয়া

* এই পত্রের জন্য আমি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ।

আসিয়াছে। উল্লিখিত পত্রখানি ব্যতীত তাঁহার কবিতার মধ্য হইতেও তাঁহার শৈশবের ইতিহাস কতকটা জানিতে পারা যায়। "প্রবাসীর জন্মভূমি দর্শন" শীর্ষক কবিতায় তিনি লিখিতেছেন,—

"যখন পড়িনি আমি শুনেছি ছ মাসে
ছাড়িয়া গেলেন পিতা ত্রিদিব নিবাসে ;
অনাথা জননী কোলে করিয়া আমারে,
দিলেন সাঁতার ঘোর দুঃখের পাথারে ;
ভাসিতেন দিবানিশি নয়নের জলে,
ছিল না এমন কেহ যে আমার বলে ;
যেদিন জুটিত যাহা কপালের জোরে,
আপনি না খেয়ে কিছু খাওয়াতেন মোরে ;
ক্রমে ক্রমে জড়িত হলেন ঋণজালে,
হায় বিধি এত দুঃখ ছিল তাঁর ভালে।"

গ্রাম্য পাঠশালায় কৃষ্ণচন্দ্রের বিদ্যা আরম্ভ হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা জননী তাঁহাকে ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে লইয়া মাণিক্যচন্দ্রের মাতুল বাখরগঞ্জনিবাসী ৺ প্রসন্নকুমার সেন জমিদার মহাশয়ের বাড়ীতে বাস করেন। এই খানেই প্রকৃত পক্ষে কবির শিক্ষার সূত্রপাত হয়। ইতিপূর্ব্বে সেনহাটিতে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট তিনি কিছু পারসী শিক্ষা করিয়াছিলেন।

পরিণত জীবনে যে কৃষ্ণচন্দ্রের সৌম্য, গম্ভীরমূর্ত্তি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন সেই কৃষ্ণচন্দ্র বাল্যে নিতান্ত দুরন্ত ও চঞ্চল ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। একবার তিনি কীর্ত্তিপাশার এক খালে পড়িয়া যান এবং প্রায় এক মাইল ভাসিতে ভাসিতে গিয়া এক গাছে আটক

পড়েন। সে যাত্রায় গাছটি তাঁহার প্রাণরক্ষার সহায়স্বরূপ হইয়াছিল। আর একবার তিনি একতলার ছাদ হইতে মাটিতে পড়িয়া যান। সে যাত্রায়ও তাঁহার বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। একবার এক দুর্দ্দান্ত ক্ষিপ্ত মহিষের সম্মুখে যাওয়ায় মহিষ তাঁহাকে দুই শৃঙ্গে তুলিয়া লইয়া পলায়। অনেক কষ্টে সেবার তাঁহার জীবন রক্ষা পাইয়াছিল। *

রা, সের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে কৃষ্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন যে তিনি বাল্যে নিতান্ত বিলাসী ছিলেন; ভাল ভাল বস্ত্র না পাইলে তাঁহার মন উঠিত না। গীত বাদ্যে তাঁহার আসক্তি জন্মিয়াছিল। একমাত্র পুত্র বলিয়া জননী যথাসম্ভব তাঁহার আব্দার রক্ষা করিতেন। ক্রমে তাঁহার দ্যুতক্রীড়ায় আসক্তি জন্মিল। বিধবা জননী ঋণ করিয়া টাকা আনিতেন, দুর্ব্বুদ্ধি কৃষ্ণচন্দ্র সময়ে সময়ে তাহা হইতেও চুরি করিতেন। একথা তিনি তাঁহার আত্মবৃত্তান্তে অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। একবার কয়েকটী সঙ্গীর সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি কলিকাতায় পলাইয়া আসেন। তখনো রেল হয় নাই, কাজেই তাঁহাদিগকে এই সুদীর্ঘ পথ পদব্রজেই অতিবাহন করিতে হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের আত্মচরিতে এই পলায়ন ব্যাপারের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই বৃত্তান্ত কৌতূহলোদ্দীপক হইলেও তাঁহার বর্ত্তমান জীবনচরিত গ্রন্থে উহার সবিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন নাই। নানা স্থানে ঘুরিয়া তাঁহারা একদিন সায়াহ্নে কলিকাতার নিকটে কালীঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে রাজপথের পার্শ্বে একস্থানে কতকগুলি বৃহৎ ভেক দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন, কারণ সেরূপ বৃহৎ ভেক তিনি তৎপূর্ব্বে আর কখনো দেখেন নাই। বালস্বভাববশতঃ তিনি

* শ্রীযুক্ত হরিচরণ সেন মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃহীত।

মনে করিয়াছিলেন রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানে রাজধানীর উপযুক্ত বৃহৎ ভেক থাকাই সম্ভবপর। গ্রামের ভেক অপেক্ষা রাজধানীর ভেক অবশ্যই বৃহৎ হইবে ইহাই তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল। কালীঘাটের কালীবাড়ীতে তাঁহারা অতিথি হইলেন। সেখানে অন্যান্য প্রসাদভোজি-দিগের সহিত আহারে বসিয়া কিছু যত্নের অভাব হওয়ায় তাঁহারা উঠিয়া গেলেন। সঙ্গিদিগের মধ্যে একজনের গলায় একটি স্বর্ণমাদুলি ছিল। তাঁহারা সেই মাদুলির পরিবর্ত্তে কয়েক পয়সার পেয়ারা ভক্ষণ করিলেন। তাহাতেও ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল না। কিন্তু দেবীর নাটশালায় সঙ্গীতোপক্রম দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গীত শ্রবণ করিতে বসিলেন। হঠাৎ তাঁহার সম্মুখের উপবিষ্টগণের অন্তরাল হইতে দেখিলেন তাঁহার দেশস্থ একজন আত্মীয় একপার্শ্বে দণ্ডায়মান আছেন। অধিকক্ষণ এরূপভাবে কাটিল না, অবিলম্বে উক্ত আত্মীয়ের নিকট কৃষ্ণচন্দ্র ধরা পড়িলেন। অন্যান্য সঙ্গিগণও ধৃত হইলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই সকলকে বাড়ী ফিরিতে হইল। ইহার পর কয়েক বৎসরের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের ভাগ্যে অন্য কোথাও যাওয়া ঘটে নাই; দেশে থাকিয়া তিনি পুনরায় পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। *

গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় তাঁহার বাঙ্‌লা লেখা পড়ার আরম্ভ ও ঢাকা নর্ম্যাল স্কুলে তাহার শেষ হয়। তিনি গ্রামের লেখাপড়া শেষ করিয়া তাঁহার জ্ঞাতি ৺গৌরচন্দ্র দাশ মহাশয়ের সহিত ঢাকায় গমন করেন। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে উক্ত দাশ মহাশয় ঢাকা জজ আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। ইঁহার আশ্রয়ে থাকিয়াই কৃষ্ণচন্দ্র সুচারুরূপে পারস্যভাষা ও পরে সংস্কৃত শিক্ষা করেন।

রা, সের ইতিবৃত্ত - ৩—১৩ পৃষ্ঠা।

পরে তিনি কীর্ত্তিপাশার জমিদার ৺ প্রসন্নকুমার সেনের ঢাকার বাড়ীতে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত লালমোহন বসাকের নিকট কৃষ্ণচন্দ্র পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি তাঁহার আত্মচরিতে বলিয়াছেন এই দুইটি ভাষা শিক্ষা করিয়া তাঁহার মনে বিদ্যাভিমান জন্মিয়াছিল। কিন্তু একদিন এক ব্যক্তি পারস্য ভাষার হস্তাক্ষর বিশিষ্ট একখানি কাগজ লইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উহা অনুবাদ করিয়া দিতে বলে; কৃষ্ণচন্দ্র উক্ত হস্তাক্ষর সুচারু-রূপে পাঠ করিতে পারেন নাই; স্বীয় আত্মচরিতে এই সামান্য ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন এই ঘটনায় তাঁহার আত্মাভিমান চূর্ণ হইয়া গেল। বস্তুতঃ পারস্য ভাষার হস্তাক্ষর পাঠ করা অনেক সময়ে কঠিন হইয়া উঠে। কৃষ্ণচন্দ্র সুশ্রী ছিলেন না, কিন্তু তিনি কৈশোরে অনেক সময়ে নিজেকে সুশ্রী মনে করিতেন এ কথাও তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন। সেই সময়ে তিনি বসন ভূষণ, এমন কি পাদ-চারণ সম্বন্ধেও একটা পারিপাট্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন। ঢাকায় পাঠ সমাপ্ত করিতে তাঁহার কয় বৎসর লাগিয়াছিল তাহা ঠিক জানিতে পারা যায় না। কিন্তু তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন তিনি আর বালক নহেন; পারস্য ও সংস্কৃত সাহিত্যে লব্ধপ্রবেশ হইয়া যুবক কৃষ্ণচন্দ্র সেনহাটিতে ফিরিয়া আসিলেন।



চতুর্থ অধ্যায়।



ঢাকার কর্ম্মক্ষেত্রে কৃষ্ণচন্দ্র।

ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণচন্দ্র গৃহে দীর্ঘকাল থাকিতে পান নাই। দারিদ্র্য মানুষকে স্থির হইতে দেয় না। নিভৃত পল্লিগৃহের অনাবিল শান্তি কৃষ্ণচন্দ্রকে অধিককাল উপভোগ করিতে হয় নাই। অল্পদিনের মধ্যেই অন্নচিন্তা প্রবল হইয়া উঠিল, কাজেই তাঁহাকে কর্ম্মের সন্ধানে বাহির হইতে হইল। এই সময়ে তিনি বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত কীর্ত্তিপাশা নামক স্থানে বাঙ্‌লা বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন।

বাঙালীর গৃহে অর্থাভাবে বিবাহ একেবারে বন্ধ থাকিতে দেখা যায় না। যথেষ্ট অর্থাভাব সত্ত্বেও কৃষ্ণচন্দ্রের বিবাহ বন্ধ রহিল না। ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন সুয়াপুর গ্রামনিবাসী ৺উমাশঙ্কর সেনের কন্যা শ্রীমতী অমৃতময়ীর সহিত তাঁহার শুভপরিণয় সংঘটিত হয়। কন্যা অমৃতময়ীর বয়ঃক্রম তখন দ্বাদশবৎসর। ১২৬৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনমাসে বসন্তবায়ুর পুলকহিল্লোলের মধ্যে কবি কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের সহিত একটি বালিকাজীবনের গ্রন্থিবন্ধন হইল। কৃষ্ণচন্দ্রের বড় আশঙ্কা ছিল তিনি কুৎসিৎ, তাঁহার সহিত কোনো সুশ্রী বালিকার বিবাহ হইবে না, কিন্তু শুভদৃষ্টির সময় কৃষ্ণচন্দ্রের সে আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছিল। বিবাহের পূর্ব্বে কৃষ্ণচন্দ্র একটু বিপদে পড়িয়াছিলেন। বিবাহের দিন স্থির হইলে কন্যাপক্ষীয় কেহ কেহ তাঁহার হস্তাক্ষর দেখিতে চাহিলেন। তিনি প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন

না, কিন্তু ইঙ্গিতে সে বিষয়ে অসম্মতি জানাইলেন, কারণ ইহাতে তাঁহার মর্য্যাদার লাঘব হয়। কন্যাপক্ষীয়গণ তাহাতেও নিরস্ত না হইয়া তাঁহার বিদ্যা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন তাঁহাদের এক-জনকে একখানি পারস্য গ্রন্থের অংশবিশেষ বুঝাইয়া দিতে হইবে। এই প্রস্তাবে কৃষ্ণচন্দ্র সম্মত হইয়াছিলেন ;কিন্তু কার্য্যতঃ উক্ত পাঠ বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবার ক্লেশ স্বীকার করেন নাই। বিবাহের পর কৃষ্ণচন্দ্র স্ত্রীর প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়াছিলেন। স্ত্রীকে তিনি সহজে কোন কাজকর্ম্ম করিতে দিতে চাহিতেন না, স্ত্রীশিক্ষার প্রতি এই সময়ে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছিল। গ্রামের প্রধানদিগের সহিত তিনি স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষতা করিয়া তর্ক করিয়া বেড়াইতেন। পুরুষদিগের পক্ষে স্ত্রীলোকদিগের সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য, এই কথা তিনি সে সময়ে গ্রামের মধ্যে প্রচার করিয়া অনেকের নিকট নিন্দিত ও তিরস্কৃত হইয়াছিলেন।

অনন্যোপায় হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র কীর্ত্তিপাশার কাজটি গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু অধিক দিন এ কাজ করিতে পারেন নাই। তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া পুনরায় ঢাকা নগরীতে গমন করিলেন। ঢাকা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র।

ঢাকায় গিয়া কৃষ্ণচন্দ্র তত্রত্য নর্ম্যাল্ স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি নিজেও সেখানে অধ্যয়ন করিতেন। এই সময়েই তিনি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে যেখানে মিটফোর্ড হাঁসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে, অনুমান ইংরাজী ১৮৫৩—৫৪ অব্দে ঢাকার সেই স্থানের পশ্চিম অংশে নলগোলা নদীর ঘাটে যাইবার পথে ব্রাহ্ম নেতা ৺ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতেন। হরচন্দ্র বসু তখন সাধারণতঃ উপাসনার

কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে শিক্ষা লাভ করিয়া ঢাকায় আসেন। বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টার দীনবন্ধু মৌলিক মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্রের হিতৈষি বন্ধু ছিলেন; ব্রাহ্মসমাজের সহিত ইঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ইঁহার নামেই কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার "সদ্ভাবশতক" উৎসর্গ করিয়াছিলেন। প্রথম যৌবনেই কৃষ্ণচন্দ্রের স্বাধীনচিন্ততার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও তাঁহার প্রকৃতিগত স্বাধীন-চিন্ততার বেশ পরিচয় পাওয়া যাইত। ঢাকা নর্ম্ম্যাল স্কুলের তদানীন্তন অধ্যক্ষ এরাটুন সাহেবের সহিত তাঁহার কোনো বিষয়ে মতভেদ ও সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহার ফলে তিনি কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন।

আজ কর্ম্ম ত্যাগ করিলে কাল যাঁহাকে অন্নচিন্তায় অস্থির হইতে হইবে তাঁহার পক্ষে আয়াসলব্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করা আমাদের নিকট কিছু বিস্ময়কর বোধ হইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের স্বাধীনচিন্ততার উপর আঘাত পড়িলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিতেন না, সাংসারিক অসুবিধা, অন্নের অভাব এ সকল কথা তাঁহার নিকট নিতান্ত তুচ্ছ বোধ হইত। যে অহমিকার ভাব মহতের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করে সে অহমিকা তাঁহার মধ্যে কোনোদিন স্থান পায় নাই। কিন্তু যে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান মানুষকে পঙ্কের বহু ঊর্দ্ধে দণ্ডায়-মান পদ্মের মত আপনার স্বাধীন মহিমায় দাঁড়াইতে শিক্ষা দেয়, সেই উষ্ণতা-বিহীন আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান তাঁহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল।

বিদ্যালয়ের কর্ম্ম ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সম্মুখে একটি অভিনব কর্ম্মক্ষেত্রের দ্বার উদঘাটিত হইয়া গেল। সিপাহী বিদ্রোহের কিছু পূর্ব্বে দীনবন্ধু মৌলিক, ব্রজসুন্দর মিত্র ও জগদ্বিখ্যাত আচার্য্য



স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র

Lakshmi Printing Works

জগদীশচন্দ্র বসুর পিতা ভগবানচন্দ্র বসু এই তিন জনের চেষ্টায় ঢাকা নগরীতে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হয়। এই প্রেস হইতে প্রথমে "মনোরঞ্জিকা সভার" মুখপত্র "মনোরঞ্জিকা পত্রিকা" প্রকাশিত হইয়াছিল। মনোরঞ্জিকা সভায় সদ্বিষয়ের আলোচনা ও বক্তৃতাদি হইত। কৃষ্ণচন্দ্র এই সভার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ইহার পরে তিনি হরিশচন্দ্র মিত্র নামক এক ব্যক্তির সাহায্যে কবিতা-কুসুমাঞ্জলি নামক এক মাসিক পত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইহাতেই কৃষ্ণচন্দ্রের সদ্ভাবশতকের অন্তর্গত অনেকগুলি কবিতা প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার "অয়ি সুখময়ি উষে" এই বিখ্যাত সঙ্গীতটি সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাকরে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের কর্ম্মত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত এলাচিপুর গ্রামনিবাসী মৌলভি আবদুল করিমের পৃষ্ঠপোষকতায় ও তাঁহার প্রধান উদ্যোগে ১২৬৭ বঙ্গাব্দে ঢাকা প্রকাশ নামক সংবাদ পত্র প্রথম প্রচারিত হইল। ইহার পূর্ব্বে কলিকাতার সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সোমপ্রকাশ পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। সোমপ্রকাশের দেখাদেখি ঢাকা প্রকাশের নামকরণ হইয়াছিল। এই ঢাকা প্রকাশেই কৃষ্ণচন্দ্রের কবিত্বশক্তির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। বাল্যকালেই তাঁহার কবিখ্যাতি লাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল। একবার তিনি ধানমাগা উপলক্ষে রামপ্রসাদের সুর ও ভাবের অনুকরণে কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করিয়া তাঁহার সহোদরাকে, গায়িতে দিয়াছিলেন। সেনহাটিতে এই ধানমাগা অনুষ্ঠানটি এক সময়ে বড় মনোহর ছিল এবং বহু সমারোহের সহিত উহা সম্পন্ন হইত। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে উহা অনুষ্ঠিত হইত। শীতলা দেবীর পূজার জন্য কোনো শনি বা মঙ্গলবারে পল্লীবিশেষের পুরাঙ্গনাগণ সম্মিলিত হইয়া বাড়ী বাড়ী ভিক্ষার্থে বহির্গত

গুরুপাক দ্রব্য সকল আহার করিতেছি তাহাতে উক্ত রোগে আক্রান্ত হইবার বিশেষ আশঙ্কা আছে। এ সময়ে কিঞ্চিৎ সুরা সেবন করিলে আর ভয়ের কোনও কারণ থাকিবে না।" কৃষ্ণচন্দ্র এই প্রস্তাব শুনিয়াই তাহার বিরুদ্ধে দুই এক কথা বলিলেন, কিন্তু তথাপি সুরা আনীত হইল। সুরার উপস্থিতিতে কৃষ্ণচন্দ্রের মনের বল শিথিল হইল, তাঁহারও অজীর্ণের আশঙ্কা প্রবল হইল এবং সেই আশঙ্কা দূরীকরণার্থে তিনি উক্ত বন্ধুদিগের সহিত সুরাপান করিলেন। তিনি তাঁহার আত্মচরিতে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে এই ঘটনার পর হইতে যখনই কোথাও প্রীতি-ভোজনের নিমন্ত্রণ থাকিত তখনি তাঁহার উদরাময়ের আশঙ্কা প্রবল হইত ও তাহার প্রতিষেধকরূপে তিনি সুরা পান করিয়া উহার নিবৃত্তি করিতেন। এইরূপে তিনি রীতিমত সুরাপায়ী হইয়া উঠিলেন। এক এক সময়ে হৃদয়ে গ্লানি উপস্থিত হইত, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিতেন আর সুরা পান করিবেন না, কিন্তু পরে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইত ; প্রতিজ্ঞার বাঁধ ভাঙিয়া সুরার বন্যা আসিয়া বিপ্লব বাধাইয়া দিত, তিনি আর কোনমতেই আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন না।

যে সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র ঢাকা প্রকাশ লইয়া উৎসাহের সহিত কাজ করিতেছিলেন সেই সময়ে আর একজন সাহিত্যরথী ধীরে ধীরে আত্ম-প্রকাশ করিতেছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের সহিত তাঁহারও তখন ঘনিষ্ঠ যোগ ; সাহিত্যচর্চ্চা ও ব্রাহ্মসমাজসম্পর্কে কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল। এই প্রতিভাশালী ব্যক্তির নাম কালীপ্রসন্ন ঘোষ। সেকালে ইঁহারা ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের জন্য সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। আরমাণিটোলায় ব্রজসুন্দর মিত্রের নিজের বাড়ী হইলে কৃষ্ণচন্দ্র সেখানে ব্রাহ্ম উপাচার্য্যের কার্য্য করিতেন,



রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি, আই, ই।

সময়ে সময়ে বক্তৃতাও দিতেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষ ইহার আরও পরে ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। বঙ্গগৌরব মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ও সে সময়ে ঢাকা প্রকাশ ও ব্রাহ্ম সমাজের সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন।

সংবাদ পত্র পরিচালন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের যশোলাভ হইল। তাঁহার সম্পাদনগুণে ঢাকাপ্রকাশ তৎকালীন অল্পসংখ্যক সংবাদপত্রের মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিল। অল্পকাল মধ্যেই গ্রাহকসংখ্যায় ও প্রতিপত্তিতে উহা প্রথম শ্রেণীর কাগজের মধ্যে গণনীয় হইল। ১২৬৭ বঙ্গাব্দে তাঁহার অমর কাব্যগ্রন্থ "সদ্ভাবশতক" প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহার কবিযশোলাভও হইল, কিন্তু তাঁহার তৎকালীন সংসারের ব্যয় সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইত না। এই অভাব দূরীকরণার্থ তিনি তদনীন্তন বাঙ্‌লা ওকালতী পরীক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন। উপর্য্যুপরি দুইবার তিনি এই পরীক্ষায় উপস্থিত হন কিন্তু উহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কৃষ্ণচন্দ্র শ্রম করিয়া পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হন নাই; অন্যান্য কাজে তাঁহার এত সময় অতিবাহিত হইত যে ওকালতী পরীক্ষার জন্য ব্যবহার শাস্ত্র অধ্যয়নের মত সময় তাঁহার অবশিষ্ট থাকিত না, এই নিমিত্তই তিনি উক্ত পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

ইহার কিছুদিন পরে ঢাকা প্রকাশের স্বত্বাধিকারীর সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য উপস্থিত হইল। কৃষ্ণচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে ঢাকা প্রকাশে নানারূপ অনুকূল মত প্রকাশ করায় ঢাকার তদানীন্তন হিন্দু নেতৃবর্গ কুপিত হইয়া উঠিলেন ও ঢাকাপ্রকাশের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার আলোচনা চলিতে লাগিল। ফলে হিন্দুসমাজ হইতে "হিন্দু হিতৈষিণী" পত্রিকা বাহির হইল। স্বত্বাধিকারী পত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় কৃষ্ণচন্দ্রকে

সাবধান করিয়া দিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র কার্য্য গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই স্বত্বাধিকারীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন যে কাগজের স্বত্ব তাঁহার থাকিলেও তিনি স্বাধীনভাবে লেখনী চালনা করিবেন, সে বিষয়ে অধ্যক্ষ কোনমতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। এক্ষণে তাঁহার সেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হওয়ায় তিনি বিচলিত হইলেন ও কর্ম্মত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি ঢাকার অনেকেই বিরক্ত হইয়াছিলেন, ঢাকা প্রকাশের স্বত্বাধিকারীর সহিতও এ বিষয়ে তাঁহার মতভেদ হইল, সুতরাং তিনি ঢাকা প্রকাশের সংস্রব ত্যাগ করিলেন।

এইসময়ে ঢাকার বিখ্যাত সাহাবাবুগণ "বিজ্ঞাপনী" নামে একখানি সংবাদ পত্র প্রচার করিবার আয়োজন করিতেছিলেন; কৃষ্ণচন্দ্রকে তাঁহারা উহার সম্পাদক নিযুক্ত করিলেন। কিছুদিন পরে আবার ঢাকাপ্রকাশের স্বত্বাধিকারীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে উহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন, কিন্তু কিছুদিন কাজ করিবার পরই তাঁহার মস্তিষ্কের পীড়া দেখা দিল। যে বার তিনি প্রথম সেনহাটি হইতে তাঁহার মাতা ও স্ত্রীকে লইয়া ঢাকায় যাইতেছিলেন সেইবারে বিক্রমপুরের অন্তর্গত দীঘির পাড়ের সুপ্রসিদ্ধ বাজারের নিকট তাঁহার প্রথম উন্মাদ রোগ প্রকাশ পায়। তাঁহাদের নৌকার পশ্চাতে অন্য নৌকায় শ্রীযুক্ত হরি মোহন দাশ গুপ্ত মহাশয় আসিতেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের মাতা হরি-মোহনকে ডাকিয়া ব্যাপার বলিলেন। হরিমোহন তাঁহাদের নৌকায় গিয়া দেখিলেন কৃষ্ণচন্দ্র অকারণ ভয় পাইয়া বার বার লুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাকে বুঝাইতে গেলে কোনো কথা বুঝিতে চাহিতেছেন না। হরিমোহনের তখনি আশঙ্কা হইল কৃষ্ণচন্দ্র উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন. তাঁহার উন্মাদরোগের সূচনা দেখিয়া লোকে বলিতে

লাগিল যে হাফিজ পাঠের ফলেই তাঁহার মস্তিষ্কের বিকার জন্মিয়াছে। হাফিজ সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে, তাহা হইতেই লোকের এই বিশ্বাস ধীরে ধীরে ব্যাপ্ত ও বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে। একদা হাফিজের পিতৃব্য সাদী সূফীবাদ সম্বন্ধে একটি কবিতা রচনা করিতেছিলেন। তিনি কবিতার একটি মাত্র পংক্তি লিখিয়া কার্য্যোপলক্ষে গৃহের বাহিরে গিয়াছিলেন, সেই অবসরে হাফিজ উক্ত পংক্তির সহিত আর একটি পংক্তি সংযোগ করিয়া দেন। সাদী ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন একটি পূর্ণ যুগ্মক রচিত হইয়াছে; তখন তিনি হাফিজকে সমগ্র কবিতাটি রচনা করিতে আদেশ করিলেন; ইহার পর তাঁহাকে অভিসম্পাত করিয়া বলিলেন, "যে কেহ তোমার এই রচনা পাঠ করিবে সে-ই উন্মাদরোগে আক্রান্ত হইবে।" মুসলমানগণ এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া এখনও বলিয়া থাকেন যে সাদীর সেই অব্যর্থ অভিসম্পাতের ফলেই হাফিজ পাঠক মাত্রেই উন্মাদ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণচন্দ্রের অকৃত্রিম বন্ধু শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেন পানদোষ, অসূয়া ও হাফিজ পাঠের ফলেই তাঁহার উন্মাদ রোগ জন্মিয়াছিল। তিনি উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হইলেও ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ দেখা যাইত। ঈশ্বরপ্রসঙ্গ তিনি ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার উন্মাদ অবস্থায় ঢাকায় শ্যামাচরণ বাবু একদিন আহার করিতে বসিয়াছেন এমন সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিয়া বলিলেন, "শ্যামাচরণ বাবু, অন্নের আর কি প্রয়োজন আছে? সুধু ঐ সূর্য্যের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকুন্ আর জল পান করুন, সকল ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হইবে।" শ্যামাচরণ বাবু কৃষ্ণচন্দ্রকে আহার করাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র কিছুতেই আহার করিলেন না। এই সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র একপ্রকার আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

উন্মাদ অবস্থায় কৃষ্ণচন্দ্রের মনে সর্ব্বদাই নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইত। সকলে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে এইরূপ চিন্তা সময়ে সময়ে তাঁহাকে নিতান্ত অধীর করিত। কখনো বা স্বীয় স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হইত; সেই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি স্ত্রীকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতেন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও অসীম প্রেম ছিল। অবশেষে তাঁহার সেনহাটিতে ফিরিয়া যাওয়া স্থির হইল। ঢাকা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তত্রত্য শ্রীযুক্ত নন্দকুমার গুহের নিকট তাঁহার অমূল্য সম্পত্তি "সদ্ভাবশতকের" গ্রন্থস্বত্ব ৩০০৲ তিনশত টাকায় বিক্রয় করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র ফকির হইয়া সেনহাটির বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।



পঞ্চম অধ্যায়।

পীড়িতাবস্থায় স্বদেশবাস।

উন্মাদরোগ লইয়া কৃষ্ণচন্দ্র স্বদেশে ফিরিলেন। তখন ঢাকা হইতে খুলনা পর্য্যন্ত ষ্টীমার যাতায়াত করিত না; রেলপথও হয় নাই। এই সুদীর্ঘ পথ নৌকায় যাতায়াত করিতে হইত। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনি একদিন নৌকা হইতে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়েন, অনেক কষ্টে তাঁহাকে উদ্ধার করা হয়। সেনহাটিতে আসিয়া কিছুদিন তিনি একেবারে লোকচক্ষুর অন্তরালে বাস করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় তিনি নিজে কাহারও বাড়ী যাইতেন না, কেহ নিকটে আসিয়া কোনো কথা না কহিলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কাহারও সহিত কথা কহিতেন না। দিবানিশি যেন কি এক গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন, কি যেন হারাইয়া গিয়াছে সর্ব্বদা তাহারই অনুসন্ধান করিতেন। এইরূপ অবস্থায় কিছুকাল কাটিয়া গেল।

মস্তিষ্কের উক্তরূপ বিকৃত অবস্থায় কৃষ্ণচন্দ্র "রা, সের ইতিবৃত্ত" নাম দিয়া তাঁহার আত্ম-জীবনী রচনা করেন। শৈশব হইতে ঢাকা নগরী ত্যাগ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের অনেক কথা বিশৃঙ্খলভাবে এই গ্রন্থে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ এখন নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। উন্মাদ অবস্থায় একবার তাঁহার আত্মীয় প্রসন্নকুমার সেন মহাশয় তাঁহাকে কীর্ত্তিপাশায় লইয়া যান। সেখানে গিয়া কৃষ্ণচন্দ্র উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। একদিন তিনি স্থানীয় বাঙলা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে

বসিয়া গৃহের ভিতরে কিরূপ অধ্যাপনা হইতেছে তাহাই শুনিতেছিলেন, একজন পণ্ডিত ছেলেদের বল্মীক সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছিলেন ; একে একে সকল ছাত্রকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল কিন্তু কেহই উত্তর দিতে পারিল না। শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, "ছেলেরা আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না, কিন্তু আপনি যদি বলেন আমি একবার উহাদিগকে বিষয়টি বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে পারি।" পণ্ডিত মহাশয় ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন, "আমি একবার বুঝাইয়া দিয়া আপনার সম্মুখেই ইহাদের প্রশ্ন করিব।" কৃষ্ণচন্দ্র সংক্ষেপে বল্মীক কি তাহা বুঝাইয়া দিয়া এক এক করিয়া যতগুলি ছাত্র ছিল সকলকে প্রশ্ন করিলেন, সকলেই ঠিক উত্তর দিল। তখন কৃষ্ণচন্দ্রের মুখ প্রসন্ন হইল, তিনি বলিলেন, "আমি তোমাদের যৎসামান্য কিছু পুরস্কার দিব।" ইহার পরে তিনি সেই শ্রেণীর পনরো ষোলটি ছাত্রের প্রত্যেককে এক খানি করিয়া রা, সের ইতিবৃত্ত পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। *

ঢাকায় অবস্থানকালে ৺রামশঙ্কর সেন মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। সেন মহাশয় ডেপুটির কর্ম্ম করিতেন। কৃষ্ণচন্দ্র যখন উন্মাদ অবস্থায় সেনহাটিতে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে রামশঙ্কর সেন মহাশয় বাগেরহাট সব ডিভিসনে বদলি হইয়া আসেন। বাগের হাট খুলনা জেলার একটি মহকুমা। পূর্ব্বের বন্ধুতা স্মরণ করিয়া সেন মহাশয় বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সেনহাটিতে আগমন করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া কথা বার্ত্তার পর তিনি তাঁহার সাংসারিক

* এই ঘটনাটি সেনহাটি নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ সেনগুপ্ত মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি ; তিনি সে সময়ে কীর্ত্তিপাশা বাঙলা বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

ও মানসিক অবস্থা কতকটা জানিতে পারিলেন। তিনি সর্ব্বদা নির্জ্জনে নীরবে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকেন কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, "আমার একটি জিনিস হারাইয়া গিয়াছে তাই খুঁজিতেছি যদি পাই।" রামশঙ্করবাবু বলিলেন, "তা' আপনি একা কেন, বলুন জিনিসটা কি, আমরা বন্ধুবান্ধবে মিলিয়া আপনার সঙ্গে একত্রে খুঁজিয়া দেখিব ও যাহাতে উহা পাওয়া যায় তাহা করিব।" তদুত্তরে কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন, "তাহা অন্যের পাইবার নহে, যদি পাই নিজেই পাইব। বোধ হয় এ জীবনে আর তাহা পাইব না।" এইরূপে কথাবার্ত্তা শেষ হইলে সেন মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্রকে অঙ্গীকার করাইলেন যে তিনি তাঁহাকে পত্রাদি লিখিলে তাহার উত্তর দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ইহার উপর তিনি বাগেরহাটে ফিরিয়া যান।

কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া গিয়া রামশঙ্কর সেন মহাশয় বাগেরহাট মহকুমার অন্তর্গত পিলজঙ্গ নওয়াপাড়ার জমিদারদিগকে একটি উচ্চ-শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত করেন। উক্ত বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রকে সেখানে পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করাইলেন। বেতন অতি সামান্য ধার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু কর্ম্মবিহীনভাবে ভীষণ দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে তাঁহার দিন কাটিতেছিল। এই কাজটি পাওয়ায় তাঁহার অভাব কতকটা দূর হইল। ইহার পূর্ব্বে চারি পাঁচ বৎসর তাঁহার সহৃদয়া ভগ্নী তাঁহার সম্পন্ন স্বামীর আনুকূল্যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র এ সকলের কোনো সংবাদ রাখিতেন না। কোথা হইতে সংসার চলিতেছে এ চিন্তা তাঁহার মস্তকে প্রবেশ করিত না। কীর্ত্তিপাশায় তাঁহার সামান্য ভূসম্পত্তি ছিল তাহার আয়ও এ সময়ে তাঁহার যথেষ্ট উপকারে আসিয়াছিল। পিলজঙ্গ বিদ্যালয়ে

তাঁহাকে অধিকদিন কাজ করিতে হয় নাই। এখানে কাজ করিবার সময় তিনি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। সপ্তাহের ছয়দিন তিনি চিপিটক, ছোলা ও গুড় প্রভৃতি খাইয়া কাজ করিতেন। শনিবার বাড়ী যাইতেন। সপ্তাহের মধ্যে রবিবার দিন মাত্র তাঁহার ভাগ্যে অন্ন জুটিত।

পিলজঙ্গে কাজ করিবার সময় কৃষ্ণচন্দ্র প্রয়োজন বশতঃ একবার বাগেরহাটে গিয়াছিলেন। সেনহাটি গ্রামের ৺কাশীচন্দ্র সেন মহাশয় তখন বাগেরহাট ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে দুই তিনটি বন্ধু ছিলেন; তাঁহারা উক্ত কাশীচন্দ্র সেন মহাশয়ের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। সেন মহাশয় সমাগত অতিথিদিগের সৎকারের নিমিত্ত যথাসাধ্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। আহারের সময় ডাক পড়িলে আর সকলে গাত্রোত্থান করিলেন কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিলেন। কাশীচন্দ্র মনে করিলেন বোধ হয় কৃষ্ণচন্দ্রের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা ও সমাদর করা হয় নাই কিংবা কোন প্রকারে যত্নের ক্রুটি হইয়া থাকিবে। তিনি আরও অধিক যত্ন করিয়াও কৃষ্ণচন্দ্রকে আহার করাইতে পারিলেন না। তিনি কেন আহার করিবেন না, তাহার কোনো কারণও বলিলেন না। অনেক পীড়াপীড়ির পর কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত সমাগত অতিথিদিগের মধ্যে একজন প্রকাশ করিলেন যে কৃষ্ণচন্দ্র ঋণগ্রস্ত হওয়ায় যতদিন ঋণ পরিশোধিত না হইবে ততদিন অন্নগ্রহণ করিবেন না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে আহার করাইবার চেষ্টা বৃথা। কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ব্বেই দোকান হইতে চিঁড়া খাইয়া আসিয়াছিলেন সুতরাং উপবাসী রহিলেন না। তাঁহার এই অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা দেখিয়া কেহ বলিলেন তাঁহার মস্তিষ্কের দোষ সম্পূর্ণ দুরীভূত হয় নাই, কেহ বলিলেন এইরূপে

শরীরকে লাঞ্ছিত করিলে পীড়িত হইয়া তাঁহাকে আরও অধিক ঋণগ্রস্ত হইতে হইবে, কেহ বলিলেন প্রতিজ্ঞাপালনের এমন জলন্ত দৃষ্টান্ত সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।

পিলজঙ্গ বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কালে আর একটি ঘটনা ঘটে। আত্ম-চিন্তা করিতে করিতে কৃষ্ণচন্দ্রের একদিন মনে হইল জীবনে অনেক পাপ করিয়াছেন, তাহার জন্য শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে। যেই এই চিন্তা মাথায় আসিল অমনি বাগেরহাটে যাত্রা করিলেন। পিলজঙ্গ বাগেরহাট মহকুমার অধীন। কৃষ্ণচন্দ্র বাগেরহাটে গিয়া ম্যাজি-ষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হইলেন। কোর্ট সব ইন্সপেক্টর উপেন্দ্রনাথ সেনের বাড়ী সেনহাটি, তিনি কৃষ্ণচন্দ্রকে ফৌজদারি আদালতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার নিকট গিয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র আনুপূর্ব্বিক সব বলিলেন। কোর্ট সবইন্সপেক্টর তখন ডেপুটির নিকটস্থ হইয়া চুপে চুপে তাঁহার নিকট সকল কথা বলিলেন। যখন কৃষ্ণচন্দ্র আত্মকাহিনী বলিবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইলেন তখন সকলে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। নিজের বিরুদ্ধে যখন তাঁহার অভিযোগ রুজু হইল তখন ম্যাজিষ্ট্রেট রায় প্রকাশ করিলেন, "আমি অপরাধীকে শাস্তি দিতেও পারি, ক্ষমা করিতেও পারি,—আমি আপনাকে ক্ষমা করিলাম।"

পিলজঙ্গে পাঁচ ছয় মাস এইরূপে কাটাইবার পর যশোহর জেলা স্কুলের হেড পণ্ডিতের পদ শূন্য হয়। এই সংবাদ অবগত হইয়া রাম শঙ্কর সেন মহাশয় তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল সমূহের ইন্সপেক্টর মিঃ গ্যারেটকে অনুরোধ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে উক্ত পদে নিযুক্ত করাইলেন। যশোহরের ডেপুটি ইন্সপেক্টার কৃষ্ণচন্দ্রের বিরুদ্ধে লিখিয়া পাঠাইলেন তিনি উন্মাদ, তাঁহার দ্বারা বিদ্যালয়ের কাজ

কোনমতেই নির্ব্বাহিত হইতে পারিবে না। কিন্তু গ্যারেট সাহেবের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দাস তাঁহার নিকট কৃষ্ণচন্দ্রের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিলে তিনি তাঁহার নিয়োগ অনুমোদন করিলেন। রামশঙ্কর সেনের মত দুর্দ্দিনের বন্ধু কৃষ্ণচন্দ্রের আর অধিক ছিলেন না। তাঁহার সহৃদয়তার ফলেই কৃষ্ণচন্দ্র যশোহর বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদলাভ করিলেন। এই কাজটি পাইয়াছিলেন বলিয়া শেষ জীবনে তাঁহাকে অন্নাভাবে মরিতে হয় নাই। এই কর্ম্মই তাঁহার শেষ জীবনের সম্বল ও শান্তিস্বরূপ হইয়াছিল। যশোহর তাঁহার জীবনের আর একটি বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্র। আমরা এবার তাঁহার যশোহরে যাপিত জীবনের কিছু আভাস দিতে চেষ্টা করিব।





৺রায় রামশঙ্কর সেন বাহাদুর।

Lakshmi Printing Works.

ষষ্ঠ অধ্যায়।



যশোহরে অবস্থানকাল।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে কৃষ্ণচন্দ্র যশোহর জেলা স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইলেন। যশোহর তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় কর্ম্মক্ষেত্র। ঢাকায় তাঁহার নির্ভীক সম্পাদক মূর্ত্তি, তরুণ কবি-মূর্ত্তি আমরা দেখিয়াছি, যশোহরে তাঁহার শান্ত, সৌম্য অধ্যাপক মূর্ত্তিও পাঠকের পক্ষে দেখিবার সামগ্রী।

কৃষ্ণচন্দ্র যে সময়ে যশোহরে প্রধান পণ্ডিত হইয়া আসিলেন তখন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার মিঃ আলেকজাণ্ডার স্মিথ্ বিদ্যালয় কমিটির সভাপতি ছিলেন। ৺ যোগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, (যিনি পরে ডি, এল্ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং হিন্দু আইন সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়া সুপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন) তখন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। "ছুঁছুন্দরী বধকাব্য" রচয়িতা ৺জগদ্বন্ধু ভদ্র তখন উক্ত বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। এই কাব্যখানি যে মাইকেলের "মেঘনাদ বধ কাব্য"কে ব্যঙ্গ করিবার জন্য রচিত হইয়াছিল তাহা পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। যশোহরের বিখ্যাত উকিল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার মহাশয় তখন উক্ত বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। যশোহরে কর্ম্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধে যোগেন্দ্র বাবু ও জগদ্বন্ধু বাবু উভয়েই সহায়তা করিয়াছিলেন।

কবি যখন যশোহরে তখন তাঁহার পূর্ব্বের কবিত্বশক্তি লুপ্ত হই-

য়াছে। কবি-জীবন যাপন করাই তখন তাঁহার লক্ষ্য ছিল। সকল কাজের মধ্যে একটা ছন্দ, একটা শৃঙ্খলা রাখিয়া চলা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যালয়ে তিনি কখনও বিলম্বে যাইতেন না। নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বে প্রত্যহ বিদ্যালয়ে গিয়া উপস্থিত হইতেন। তাহার পর ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ক্লাশে গিয়া বসিতেন। কে আসিয়াছে, না আসিয়াছে তাহা দেখিতেন না, কোনদিকে দৃকপাত না করিয়া তিনি পড়াইতে আরম্ভ করিতেন এবং ঘণ্টাটি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পাঠনা হইতে ক্ষান্ত হইতেন না। ছাত্রগণ গোলমাল করিবার অবকাশই পাইত না। তাহার অধ্যাপনা সম্বন্ধে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু (ঢাকা কলেজের গণিতাধ্যাপক)' শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত ছাত্রগণের নিকট হইতে অনেক ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়।

পাঠনাকালে তিনি কিরূপ তন্ময় থাকিতেন তাহার উদাহরণ স্বরূপ এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি যখন পড়াইতেন সে সময়ে কোন ছাত্র বাহিরে যাইতে চাহিলে তিনি বিনা আপত্তিতে তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন। একদিন এক শ্রেণীর ছাত্রগণ পরামর্শ করিল যে একে একে তাহারা সকলেই বাহিরে যাইয়া ক্লাশ ছাত্রশূন্য করিয়া ফেলিবে। কাজেও তাহাই হইল। প্রথমে একজন, তাহার পর আর একজন, এইরূপ করিয়া মাত্র একজন ব্যতীত ক্লাশ শুদ্ধ ছাত্র বাহিরে চলিয়া গেল; কৃষ্ণচন্দ্র যথারীতি পড়াইয়া যাইতেছেন। যখন এই শেষ ছাত্রটি অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া কবির নিকট আসিয়া ছুটি চাহিল তখন কৃষ্ণচন্দ্র কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিলেন, "যাও, কিন্তু একজনকে পাঠাইয়া দিও নতুবা

কাহাকে পড়াইব?" ছাত্রটি বাহিরে চলিয়া গেল—কৃষ্ণচন্দ্র সেই শূন্য গৃহেই যথারীতি আপনার বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন। অল্প-ক্ষণের মধ্যেই গৃহ আবার ছাত্রে পরিপূর্ণ হইল। এ ক্ষেত্রে ছাত্র-দলই যে পরাজিত হইয়াছিল তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি যেমন পারস্য ভাষা এবং স্ফী সাহিত্যের অনুশীলন ও চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যশোহরে অবস্থান কালে তিনি তেমনি বৌদ্ধ দর্শন ও সাহিত্যের চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন। স্ফী সাহিত্যের আলোচনার ফলে যেমন সদ্ভাবশতকের জন্ম হইয়াছিল, বৌদ্ধ দর্শন ও সাহিত্য চর্চ্চার ফলে তেমনি তাঁহার "মোহভোগ" ও "কৈবল্য তত্ত্ব" রচিত হয়। ১২৮৯ বঙ্গাব্দে উহা প্রকাশিত হয়। ঐ সময়ে তাঁহার ধর্ম্মমত কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

যশোহরে অধ্যাপনা কালেও তিনি উন্মাদ রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারেন নাই, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। কোন কোন বিষয়ে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতির পরিচয় সর্ব্বদাই পাওয়া যাইত। এ বিষয়ে তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকে অনেক ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকেন। এখানে তাঁহার বিকৃত মস্তিষ্কের দুই একটি উদাহরণ দেওয়া গেল, পাঠকবর্গ তাহা হইতে সার সঙ্কলন করিতে পারিবেন। ইংরাজী ১৮৭৫।৭৬ সনে যশোহরের রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু মহাশয়দ্বয় যশোহর জেলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তাঁহাদের সহিত জোসিয়া বসু নামক জনৈক দেশীয় খ্রীষ্টান পড়িত। তাঁহাদের পরবর্ত্তী শ্রেণীতে উক্ত জোসিয়ার কনিষ্ঠ পিটার পড়িত। কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রগণ অপেক্ষা এই দুইটি বালককে অধিক অনুগ্রহ করিতেন। তাহাদের সহিত

বাক্যালাপেও এই বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ পাইত। তিনি অন্যান্য ছাত্রগণকে "তুমি" সম্বোধন করিতেন কিন্তু উক্ত দেশীয় খ্রীষ্টান বালক-দ্বয়কে "আপনি" সম্বোধন করিতেন। কালীপদবাবু যে শ্রেণীতে পড়িতেন সেই শ্রেণীর একটি বালক কিছু দুঃসাহসী ছিল। একদিন সে কৃষ্ণচন্দ্রকে ক্লাসের মধ্যেই জিজ্ঞাসা করিল, "পণ্ডিত মহাশয়, আপনি জোসিয়া ও পিটারকে 'আপনি' বলেন কিন্তু আমাদের 'তুমি' বলেন কেন ?" কৃষ্ণচন্দ্র উত্তরে বলিলেন, "উঁহারা রাজধর্ম্মাবলম্বী, রাজ-ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগকে সম্মানের সহিত সম্বোধন করা উচিত।" এই ঘটনাটির মধ্যে আর কিছু প্রকাশ না পাইলেও কৃষ্ণচন্দ্রের মতের স্বাধীনতা বেশ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্র তোষামোদ জানিতেন না, পাঠক পূর্ব্বে তাহার পরিচয় পাইয়াছেন ; এই অধ্যায়ে তাঁহার স্বাধীনচিত্ততার আরও পরিচয় পাইবেন। তাঁহার নিকট যখন যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইত তখনি তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। তাঁহার এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এমন একাগ্র ছিল যে অনেক সময়ে তাহা বাতুলের কার্য্যের মতই দেখাইত।

কৃষ্ণচন্দ্র যশোহরে একাকী একখানি কুটিরে বাস করিতেন। কুটিরখানি জনৈক স্ত্রীলোকের নিকট হইতে তিনি ভাড়া লইয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে পাক করিতেন। বিদ্যালয়ের কার্য্য ও গৃহস্থালীর জন্য অপরিহার্য্য কয়েকটি কার্য্য সমাপ্ত হইলেই তিনি অনন্যমনে অধ্যয়ন করিতে বসিতেন। গৃহে তক্তাপোষ বা বিশেষ কোনরূপ শয্যোপকরণ ছিল না, সামান্য একখানি মাদুর সাধারণতঃ গৃহের মেঝেয় আস্তৃত থাকিত। কৃষ্ণচন্দ্র সামান্যতম বিষয়েও কাহারও সাহায্যপ্রার্থী হইতে চাহিতেন না। স্বাবলম্বনপ্রিয়তা তাঁহার অস্থিমজ্জাগত

হইয়া গিয়াছিল। যে কুটিরের উল্লেখ করা গেল একবার প্রবল ঝড়ে উহা ভূমিসাৎ হয়। কৃষ্ণচন্দ্র তল্পী লইয়া তখন তাঁহার আত্মীয় যশোহরের উকিল ৺প্রসন্নকুমার দাশ গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে পনরো দিনের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করেন। এইরূপ আশ্রয় প্রার্থনা তাঁহার জীবনে অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। কৃষ্ণচন্দ্র আশ্রয়প্রার্থী হইলে প্রসন্নবাবু নিতান্ত আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে গৃহে স্থান দিলেন এবং যাহাতে তাঁহার কোন অসুবিধা না হয় সে জন্য সকলকে সতর্ক থাকিতে আদেশ করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সুবিধা অসুবিধা কিছুই ছিল না, একটু থাকিবার স্থান হইলেই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইত। একে একে পনরোটি দিন কাটিয়া গেল। ষোড়শ দিবসের প্রাতঃকালে উঠিয়াই কৃষ্ণচন্দ্র আপনার তল্পি তুলিয়া গৃহস্বামীর নিকট বিদায় লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। গৃহস্বামী শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিবা মাত্র কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে প্রার্থিত কালের নিমিত্ত উক্ত বাটীতে আশ্রয় পাওয়ার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আজ আমি অন্যত্র যাইতেছি।" প্রসন্নবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার গৃহ মেরামত হইয়া গিয়াছে?" কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন, "সম্পূর্ণ হয় নাই, কবে হইয়া উঠিবে তাহাও বলা যায় না।" প্রসন্ন বাবু বলিলেন, "তা' যতদিন না হয় আপনি আমার বাড়ীতে থাকুন, আমি তাহাতে সুখী হইব; আপনি থাকিলে আমার কোনো অসুবিধা নাই।" কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন, "না, আমি পনরো দিনের নিমিত্ত আশ্রয় চাহিয়াছিলাম, সে নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে, আমি আর এক দণ্ডও এখানে থাকিতে পারি না।" কৃষ্ণচন্দ্র কোনমতেই আর রহিলেন না; প্রভাতের পূর্ব্ব হইতেই টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছিল, তিনি সেই বৃষ্টি মাথায় করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। এই ঘটনাটি কবির

স্বাবলম্বনপ্রিয়তার পরিচায়ক অথবা সত্যবাদিতার দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহা চিন্তাশীল পাঠককে অবশ্যই বলিয়া দিতে হইবে না।

যশোহরের জনৈক সবজজ একবার কৃষ্ণচন্দ্রের গুণগ্রামের কথা শুনিয়া তত্রত্য উকিল বাবু মহেন্দ্রনাথ সেন দ্বারা তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠান। সদ্ভাবশতকের কবি কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিবার কৌতূহল অনেকেরই হইত। কারণ তাঁহার কবিতা পাঠ করেন নাই এমন লোক সেকালে বিরল ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র সামান্য বেতনভোগী পণ্ডিত মাত্র, তাঁহার সহিত দেখা করিতে সবজজ বোধ হয় কুণ্ঠা বোধ করিয়া থাকিবেন, নতুবা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন না। মহেন্দ্রবাবু যখন কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট সবজজের অভিপ্রায় জানাইলেন তখন কৃষ্ণচন্দ্র অম্লানবদনে সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিলেন। অন্য লোক হইলে হয়তো উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারিদিগের সহিত মিশিবার সুযোগ হইল ভাবিয়া আনন্দে আপনার অদৃষ্টকে ধন্যবাদ করিত। কৃষ্ণচন্দ্র কোনমতেই নিজের কাছে নিজেকে হীন প্রতিপন্ন করিতে পারিতেন না। কৃষ্ণচন্দ্রের আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান দর্শনে উক্ত সবজজ লজ্জিত ও প্রীত হইয়াছিলেন এবং স্বয়ং মজুমদার কবির অনাড়ম্বর পর্ণ কুটিরে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। যিনি এতদূর আত্মমর্য্যাদাভিজ্ঞ ও দুরদর্শী ছিলেন তিনিই আবার দেশীয় খ্রীষ্টান ছাত্রকে বিশেষ অনুগ্রহের চক্ষে দেখিতেন ইহা কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আর যাহাই হউক না কেন, উক্ত ছাত্রদ্বয়কে এইরূপ সম্ভ্রম দেখাইবার মূলে যে আর কোন উদ্দেশ্য নিহিত ছিলনা তাহা বলাই বাহুল্য।

বরিশালের শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় ইংরাজী ১৮৭০—১৮৭৭ সন পর্য্যন্ত যশোহর ছোট আদালতের জজ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অশ্বিনীবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর

কামিনী বাবু যশোহর জেলা স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। একদিন তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের আলয়ে গেলে গুরু শিষ্যের মধ্যে কথোপকথন প্রসঙ্গে কামিনীকুমার বলেন, "পণ্ডিত মহাশয়, আপনি এই ভাঙা খড়ের ঘরে থাকেন কেন? আমাদের বাড়ীর মধ্যে যে আটচালা ঘরখানি পড়িয়া আছে—আমাদের কাজে লাগে না,—সেখানে থাকুন্ না এসে!" কৃষ্ণচন্দ্র তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "কামিনি, আমার প্রতি তোমার যে শ্রদ্ধা, ভালবাসা আছে তার জন্য বড়ই প্রীত হইলাম। তুমি তোমার মতই কথা বলেছ, কিন্তু আমি সেখানে যাই কেমন করে? বড়লোকের কাছে থাকিলে আপনিই অধীনতা এসে পড়ে।" এই ঘটনাটি হইতে তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

একবার প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার স্মিথ্ সাহেব যশোহর পরিদর্শনে আসেন। ঐ দিন যশোহর বিদ্যালয়ের বালকদিগের পারিতোষিক বিতরিত হয়। স্মিথ্ সাহেব পারিতোষিক বিতরণ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত ও বাঙ্লা ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে শিক্ষকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বক্তৃতা করেন। স্মিথ্ সাহেবের আহ্বানে কৃষ্ণচন্দ্র দীর্ঘকাল ধরিয়া অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিয়া ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার দেখিয়া গুণগ্রাহী স্মিথ সাহেব ও সভাস্থ জনসাধারণ সকলেই মোহিত হইয়াছিলেন।

ইংরাজী ১৮৭৭।৭৮ সালে কৃষ্ণচন্দ্রের বেতন বৃদ্ধি হইল। সকলে সে সংবাদ সুখী হইলেন, একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র বেতন বৃদ্ধির সংবাদ বিমর্ষ হইলেন। এই বেতন বৃদ্ধি হইবার পর বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট বেতনের অধিক লইতে স্বীকৃত হন নাই এবং তাঁহার পূর্ব্বের

আয়ই তাঁহার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া উক্ত বেতন বৃদ্ধি রহিত করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের নিকট অনুরোধ করিয়াছিলেন। বেতন বৃদ্ধির চেষ্টায় লোকে আবেদন করিয়া থাকে। কিন্তু বেতনবৃদ্ধি রহিত করিবার জন্য কেহ আবেদন করিতে পারে ইহা আমাদের কল্পনার অতীত ছিল। কবি শুধু 'সন্তোষ' সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, যথার্থই তাঁহার জীবনে সন্তোষ-স্পর্শ-মণি লাভ হইয়াছিল।

যখন কৃষ্ণচন্দ্র যশোহর বিদ্যালয়ে কর্ম্ম গ্রহণ করেন তখন ৺জগদ্বন্ধু ভদ্র দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন; কিছুদিন পরে তিনি প্রধান শিক্ষক হন। তাঁহার কর্ত্তৃত্বকালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় একবার উক্ত বিদ্যালয়ের সংস্কৃতের ফল সন্তোষজনক হয় নাই। মজুমদার মহাশয় প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত তিনিই পড়াইতেন। জগদ্বন্ধুবাবু মজুমদার মহাশয়কে বলিলেন যেন তিনি ছাত্রদিগকে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে পাঠ (exercises) লিখিতে অভ্যাস করান। মজুমদার মহাশয় তাঁহার পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারেই ছাত্রদিগকে পড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। ইহাতে জগদ্বন্ধুবাবু তাঁহাকে তাঁহার প্রস্তাবিত পদ্ধতি গ্রহণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলে মজুমদার মহাশয় বলিলেন "সংস্কৃত আমার বিষয়, উহা কিরূপে পড়াইতে হইবে না হইবে তাহা আমিই স্থির করিব, অন্যান্য বিষয়ে আমি আপনার অধীন হইলেও পাঠনা পদ্ধতি স্থির করা সম্বন্ধে আমি স্বাধীন, এ কথা আপনি স্থির জানিবেন।" জগদ্বন্ধু বাবু অনন্যোপায় হইয়া ব্যাপারটি তদানীন্তন স্কুল ইন্সপেক্টার রায় বাহাদুর রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গোচরে আনিলেন। ইহার ফলে মজুমদার মহাশয় অস্থায়ীভাবে পদচ্যুত হইলেন। যাহা হউক কিছুদিন পরে তিনি স্বীয় পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই

ঘটনায় জগদ্বন্ধু বাবু মজুমদার-কবির প্রতি কিছু রুষ্ট হইলেও তাঁহার প্রতি তিনি চিরদিনই অনুকূল ও শ্রদ্ধাবান ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের এ গোলমাল মিটিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। এই ঘটনায় ইংরাজী ১৮৮৫ সনে ঘটে। এই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৮৮৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত তিনি অস্থায়ী ভাবে পদচ্যুত হইয়া স্বীয় গ্রামে বাস করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের অস্থায়ীভাবে পদচ্যুত হইবার কারণ সম্বন্ধে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বকথিত বিবরণ যশোহর জেলা স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত শশধর দত্ত মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত। দ্বিতীয় বিবরণ কবির পুত্র শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক প্রদত্ত। উহা এইরূপ; জেলা স্কুলের কোন শ্রেণীতে কয়েকটি নিতান্ত দুর্বিনীত ছাত্র ছিল। একদিন তিনি সেই শ্রেণীতে পড়াইতেছেন এমন সময় দেখিলেন উক্ত প্রকৃতির দুইটি বালক পরস্পরের প্রতি জুতা নিক্ষেপ করিয়া মারামারি করিতেছে। কৃষ্ণচন্দ্র তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। দুই তিন বার নিষেধ করা সত্ত্বেও যখন তাহারা মারামারি হইতে নিবৃত্ত হইল না তখন কৃষ্ণচন্দ্রের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া তিনি ঐ জুতা দিয়া একজনকে প্রহার করিলেন। ছেলেটি প্রহৃত হইয়া প্রধান শিক্ষকের নিকট গিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে নালিস করিল। জগদ্বন্ধু বাবু এই কার্য্যের জন্য কৈফিয়ৎ তলব করিলে কৃষ্ণচন্দ্র জানাইলেন তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা কিছুমাত্র অন্যায় হয় নাই, অতএব তিনি কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন। জগদ্বন্ধু বাবু ইহাতে নিজেকে নিতান্ত অপমানিত মনে করিয়া বিদ্যালয় কমিটির সভাপতি ও যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট ই, জে, বার্টনের নিকট কৃষ্ণচন্দ্রের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিলেন। বার্টন সদাশয়, বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী ছিলেন; কৃষ্ণ-

চন্দ্রের প্রতি নানা কারণে তাঁহার একটু শ্রদ্ধা ও স্নেহ জন্মিয়াছিল। রিপোর্ট পাইয়া তিনি কৃষ্ণচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন প্রধান শিক্ষককে ঐরূপ বলা অন্যায় হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার নিকট এ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। কৃষ্ণচন্দ্র জগদ্বন্ধু বাবুকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন, "আমি অন্যায় কিছু করি নাই যে কৈফিয়ৎ দিব, আর এ কৈফিয়ৎ দিতে অস্বীকার করাটাও অপরাধ হয় নাই, অতএব আমি ক্ষমা চাহিবনা।" অন্য কেহ হইলে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের এই কথার পর তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার ব্যবস্থা করিতেন, কিন্তু বার্টন বিন্দুমাত্রও উত্তেজিত না হইয়া বলিলেন, "ছাত্রদের শাসনের ভার আপনার উপর, যে ভাবে ইচ্ছা শাসন করিতে পারেন, কিন্তু প্রধান শিক্ষককে আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অন্যায় হইয়াছে।" এই বলিয়া সাহেব কৃষ্ণচন্দ্রকে বিদায় দিয়া জগদ্-বন্ধু বাবুকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আমি পণ্ডিতকে ডাকিয়া তোমার নিকট ক্ষমা চাহিয়া গোল মিটাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম কিন্তু সে তাহাতে নারাজি। ইহার বেশি আর কোন জোর জুলুম ওরূপ এক-জন লোকের উপর করিতে ইচ্ছা করি না। তোমার ইচ্ছা হয় তুমি তোমার বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করিতে পার।" জগদ্বন্ধু বাবু তাহাই করিলেন। প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল সমূহের ইন্সপেক্টার ৺রায় রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের নিকট কৃষ্ণচন্দ্রের বিরুদ্ধে রিপোর্ট প্রেরিত হইল। রাধিকা বাবু ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হুকুম দিলেন, কিন্তু সে হুকুমও তিনি অমান্য করায় রাধিকা বাবু উঁহাকে তিন মাসের জন্য অস্থায়ী ভাবে পদচ্যুত করিলেন। ইহাতে তিনি একেবারে চাকরী ইস্তফা দিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এরূপ ভাবে প্রায় সাত মাস কাল বাড়ীতে কাটাইলেন, অতি কষ্টে কোনমতে

সংসার চলিল। রাধিকাপ্রসন্ন তাঁহার হাতে কৃষ্ণচন্দ্রের অন্ন যায় দেখিয়া মনে মনে ক্লেশ পাইয়া অন্য লোক দ্বারা কৃষ্ণচন্দ্রকে পুনরায় চাকুরী পাইবার জন্য আবেদন করিতে পরামর্শ দিলেন ; কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। অবশেষে জয়েণ্ট ইন্সপেক্টার বাবু চন্দ্রকান্ত মজুমদার তাঁহাকে দুই তিন খানি পত্র লিখেন। শেষ পত্রে তিনি জানাইলেন যে তিনি যদি আবার চাকুরীতে যান তবে যে সাত মাস কাল তিনি কাজ করেন নাই তাহা ফার্লো বলিয়া ধরা হইবে এবং ঐ হিসাবে তাঁহাকে সাত মাসের বেতন দেওয়া হইবে। কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। পূর্ব্বের বিবরণ ও উমেশচন্দ্রের বিবরণ এই দুইটিই কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্রের সহিত এমন আশ্চর্য্যরূপে খাপ খাইয়া যায় যে কোনটি তাঁহার পদচ্যুতির যথার্থ কারণ তাহা ঠিক করা কঠিন। সে সময়ে এই সম্পর্কে যে সকল লেখালেখি হইয়াছিল তাহা এখন আর পাইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং কোনটি প্রকৃত কারণ তাহা নির্ণয় করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন-আলেখ্য পাঠ করিয়া যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে এই দুইটি ঘটনাই কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনে ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, কিন্তু দুইটিই তাঁহার পদচ্যুতির কারণ নহে ইহাও মনে করিবার কারণ আছে। প্রথম ঘটনাটি এমন কিছু গুরুতর নহে যাহাতে তাঁহার পদচ্যুতি ঘটিতে পারিত ; বিশেষতঃ কৃষ্ণচন্দ্র সে উপলক্ষে যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহাতে জগদ্বন্ধুবাবুকে খর্ব্ব করিবার ভাব ছিল না, অধিকন্তু আমাদের নিকট উক্ত উত্তর সমীচীন বলিয়াই বোধ হইয়াছে। কিন্তু শেষোক্ত ঘটনা যথার্থই গুরুতর। যে ব্যাপার হইতে উহার উৎপত্তি তাহাও যেমন গুরুতর, উহার পরিসমাপ্তিও তেমনি অদ্ভূত রকমের। সুতরাং উভয় ঘটনার মধ্যে

শেষোক্ত ঘটনাটিই তাঁহার পদচ্যুতির কারণ বলিয়া আমরা অনুমান করিয়াছি।

যে ছয়মাস কাল কৃষ্ণচন্দ্র গৃহে বসিয়াছিলেন তাহার মধ্যে এক কৌতুককর ঘটনা ঘটে। বৈদ্যকুলতিলক কবিরাজ ৺দ্বারকানাথ সেন মহাশয় তাঁহার দ্বিতীয়বারের বিবাহ উপলক্ষে সেনহাটিতে গমন করেন। সেনহাটিতে আসিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ জন্মে। দ্বারকানাথ তাঁহাকে দর্শন করিবার মানসে তাঁহার বাড়ীতে গেলে তিনি তাঁহার অভ্যর্থনা-সূচক একটি স্তুতি মুখে-মুখে রচনা করিয়া পাঠ করিলেন। দ্বারকানাথের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের শ্লোকটি সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল। দ্বারকানাথ অপ্রস্তুত হইবার পাত্র নহেন, সংস্কৃতে তাঁহারও অসাধারণ অধিকার ছিল, তিনিও তৎক্ষণাৎ সংস্কৃতে কৃষ্ণচন্দ্রের স্তুতি পাঠ করিলেন। মূল শ্লোকটি নগেন্দ্র বাবুর স্মরণ নাই কিন্তু তাহার অর্থ এই :—বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাইয়া মাত্র গোপিকার মনোহরণ করিতেন, কিন্তু আপনি বিনা বাঁশীতে জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছেন।

স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় নিষ্ঠার সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় জেলা স্কুল উচ্চস্থান অধিকার করিল। শিক্ষকগণ শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়-গণের নিকট হইতে পারিতোষিক পাইলেন। আবেদন করিয়া সকলকে এই পারিতোষিক গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণচন্দ্রকে আদেবন করিতে বলিলে তিনি অস্বীকার করিলেন। ফলে তাঁহার পারিতোষিক লাভ ঘটিল না।

বরিশালের শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে কৃষ্ণচন্দ্র বিশেষ

স্নেহ করিতেন। জগদীশ বাবুর সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দেখিয়াই বোধ হয় তাঁহার প্রতি এই বিশেষ স্নেহ জন্মিয়াছিল। ক্লাশে কেহ গোলমাল করিলে সাধারণতঃ কৃষ্ণচন্দ্র কিছু বলিতেন না; কিন্তু জগদীশ বাবু একবার তাঁহার কাছে একটি মিথ্যা কথা বলিয়া প্রহৃত হইয়াছিলেন। জগদীশ বাবু এখনও বলেন, "অনেক শিক্ষক দেখিয়াছি, অনেকের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছি, কিন্তু এরূপ আর কাহাকেও দেখি নাই।" কৃষ্ণচন্দ্র স্বহস্তে ৩৫।৩৬ টি বালকের অর্থপুস্তকে পরদিনের জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠের অর্থ লিখিয়া দিতেন, তাঁহার আশঙ্কা হইত যদি ছাত্রগণ নিজে লিখিতে গিয়া ভুল লিখে তাহা হইলে ভুল শিক্ষা করিবে। বিদ্যালয়ে পড়াইয়া নিজের কুটিরে গিয়া যদি কখনো মনে হইয়াছে যে পাঠনাকালে কোনো কথা ভুল বলিয়াছেন বা কোনো কথা অসম্পূর্ণ রাখায় অর্থবিকৃতি ঘটিয়াছে, অমনি তিনি ছাত্রদিগের বাড়ীতে গিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া আসিয়াছেন; এ কাজে দিন রাত্রি, ঝড়বৃষ্টি, সময় অসময় কিছুই বিচার করিতেন না। যখন জগদীশ বাবু কলিকাতায় ছিলেন তখনও কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে পত্রাদি লিখিতেন। গুরু শিষ্য পরস্পরকে সংস্কৃতে পত্র লিখিতেন। ১২৯৩ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র যশোহর হইতে "দ্বৈভাষিকী" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। বাঙলা ও সংস্কৃত এই উভয় ভাষার কবিতা প্রবন্ধাদি উহাতে প্রকাশিত হইত এই নিমিত্ত উহার নাম দ্বৈভাষিকী হইয়াছিল। দীর্ঘকাল পরেও যখন জগদীশ বাবু কৃষ্ণচন্দ্রের প্রেরিত দ্বৈভাষিকী পাইয়াছিলেন তখন তাঁহার স্নেহপূর্ণ স্মৃতি শিষ্যের হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আবেগ আনিয়া দিয়াছিল। এই দ্বৈভাষিকী পত্রিকার রচনা যে খুব ভালো হইত এরূপ মনে হয় না। উহার দুই এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়া দেখা গিয়াছে উহাতে সংস্কৃত রচনা অধিক

থাকিত ; কবিতা ও সমালোচনা সাধারণতঃ বাঙলায় লিখিত হইত। এ সময়ে কৃষ্ণচন্দ্রের কবিতা রচনার শক্তি লোপ পাইয়াছিল বলিলে অন্যায় হইবে না। ১২৯৪ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের দ্বৈভাষিকী হইতে একটি কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা গেল ; ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে তাঁহার কি প্রকার শক্তিহানি হইয়াছিল।

"দেখিলে পরের ভাল,
মন তুমি হও কাল,
কিছুতেই যায় না সে মল।
দহ যেন দাবানলে,
নিভে না তা কোন জলে,
চোখ দুটি করে ছল ছল।"

১২৮৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণচন্দ্র নৌকাযোগে যশোহর হইতে সেনহাটি যাইতেছিলেন, তাঁহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুত মহিমচন্দ্র রুদ্র মহাশয় সেই নৌকায় বাড়ী যাইতেছিলেন। মহিম বাবুর বাড়ী সেনহাটির নিকটবর্ত্তী খালিশপুর গ্রামে। সন্ধ্যা সমাগত হইলে মহিম-বাবু শীত অনুভব করিতে লাগিলেন। একে শীতের প্রারম্ভ, তাহাতে জলপথে যাত্রা, কাজেই শীত একটু বেশী বোধ হইয়াছিল। মহিম বাবুর গায়ে একটি জামা ছিল ; তিনি পেটরা খুলিয়া একখানি গরম গায়ের কাপড় বাহির করিয়া সমুদয় দেহ আবৃত করিলেন। রাত্রি এইরূপে কাটিয়া গেল। প্রভাত হইতেই মহিম বাবু গায়ের কাপড় খানি নিপুণভাবে ভাঁজ করিয়া পুনরায় পেটরায় তুলিয়া রাখিলেন। তখনো বেশ ঠাণ্ডা ছিল, সেজন্য কৃষ্ণচন্দ্র মহিমবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখনি গায়ের কাপড় তুলিয়া ফেলিলে ?" উত্তরে মহিম-বাবু বলিলেন, "কাপড় খানি আমার নয়, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য উহা ক্রয় করা হইয়াছে, নৌকা গ্রামের নিকটে আসিতেছে তাই উহা

পেটরায় তুলিলাম; আমি গায়ে দিয়াছি দেখিলে সে উহা পুরাতন হইয়া গিয়াছে বলিয়া হয়তো গ্রহণ করিতে চাহিবে না।" কৃষ্ণচন্দ্র বিমর্ষভাবে সংক্ষেপে বলিলেন, "ইহাতে তুমি তোমার ভাইকে প্রবঞ্চনা করিলে!"

কৃষ্ণচন্দ্রের প্রকৃতি শিশুদিগের ন্যায় সরল ও কোমল ছিল। যশোহরে তিনি প্রত্যহ নিজে বাজার করিতে যাইতেন। একদিন তিনি বাজারে গিয়া একটি মৎস্যের মূল্য জিজ্ঞাসা করায় মেছুনী বলিয়াছে চারি পয়সা লাগিবে। তিনি অমনি বিনা বাক্যব্যয়ে চারিটী পয়সা বাহির করিয়া দিলেন। মৎস্যবিক্রেত্রী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "দুইটী পয়সাই উহার যথার্থ মূল্য; দুইটি পয়সা দিলেই চলিবে।" তিনি বলিলেন, "তাও কি হয়? তুমি কি আর দুইটি পয়সার জন্য আমার কাছে মিছা কথা বলিয়াছ?" এইরূপ বহু ঘটনায় তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতির সরলতার পরিচয় পাওয়া যায়। *

যশোহর অবস্থানকালে তিনি বৌদ্ধ দর্শন ও বৌদ্ধ সাহিত্যের আলোচনায় মগ্ন হইয়াছিলেন ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। বাসনা বিবর্জ্জিত হইয়া জীবন যাপন করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। তাঁহার চরিত্রগুণে যশোহরবাসী মুগ্ধ হইয়াছিল, তাঁহার নিঃস্পৃহতায় লোকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অযাচিতভাবে অন্যের পক্ষে দুর্লভ সামগ্রীও তাঁহাকে দিতে চাহিত। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র তাহাতে ভুলিতেন না, অনাবশ্যক অর্থ তিনি সংসারক্ষেত্রের

* যশোহর জেলার স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র রায় চৌধুরী কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃহীত।

উৎকোচ মনে করিয়া তাহাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতেন। প্রতিবেশীর সামান্য শাক সব্জীর উপহারও তিনি ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাখ্যান করিতেন।

যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে তিনি হাফেজের ন্যায় উন্মাদ ছিছেন, প্রৌঢ়াবস্থায় তিনি তাঁহার আদর্শ বুদ্ধদেবের অনুরূপ হইয়াছিলেন ; তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠ শিষ্যদলের নিকট শুনিয়াছি যশোহরে অবস্থানকালে কৃষ্ণচন্দ্রের কুটিরখানিকে তাঁহারা ঋষির আশ্রম কিংবা বৌদ্ধ ভিক্ষুর মঠ বলিয়া মনে করিতেন এবং সেই কুটির সমীপে আসীন হস্তবিন্যস্তকপোল কৃষ্ণচন্দ্রকে তাঁহাদের বোধিদ্রুমচ্ছায়ায় ধ্যাননিরত দ্বিতীয় বুদ্ধদেব বলিয়া মনে হইত। বুদ্ধদেবের কঠোর সংযম ও বিলাসবিমুখতা তাঁহার জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিল। অতি দীনবেশে তিনি থাকিতেন ; গ্রীষ্মকালে একখানি থান ধুতি ও উত্তরীয় এবং শীতকালে একটি সামান্য জামা তাঁহার চিরন্তন পরিচ্ছদ ছিল। তিনি স্বহস্তে পাক করিতেন, তাহার উপকরণও অতি সাধারণ রকমের ছিল। কিন্তু জীবন যাত্রার বাহ্য আয়োজনে এত দীনতা সত্ত্বেও তাঁহার জীবনে মহত্ত্ব, চরিত্রে দৃঢ়তা, বাক্যে সংযম, জ্ঞানে গভীরতা, ত্যাগে আত্মবিস্মৃতি,ধর্ম্মে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা এক সঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজী ১৮৭৪ সনে যশোহরে আসিয়া ১৮৯৩ সন পর্য্যন্ত উনিশ বৎসর কাল তিনি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল ভাবে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। যিনি একদিন সুরার দাস হইয়াছিলেন তিনিই এই উনিশ বৎসর কালের মধ্যে সুরা স্পর্শ করেন নাই, সুরা তাঁহার ক্রীতদাসী হইয়াছিল। মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচয় এইখানে ; যখন সংযম প্রবৃত্তির উপর আপনার জয় পতাকা উড্ডীন করিতে সমর্থ হয়, তখনি জগৎ মানুষের মনুষ্যত্ব দেখিতে পায়, মানুষের মানুষী শক্তি দেখিয়া অবাক

হইয়া থাকে। কৃষ্ণচন্দ্রকে আমরা দেবতা বলি না ; নরদেবতা এ জগতে আছেন কি না জানি না, থাকিলেও লোক চক্ষুর অগোচরে আছেন। কিন্তু জীবন্ত মানুষ দেখিতে পাইলেই আমরা প্রকৃত পক্ষে কৃতার্থ হই। জীবন্ত মানুষ সংসারের মৃতকল্প মনুষ্যমণ্ডলীকে প্রাণদান করিয়া থাকে। কৃষ্ণচন্দ্র জীবন্ত মানুষ ছিলেন ; তিনি কবি ছিলেন এ কথাও সত্য। কিন্তু যদি তিনি কবি না হইতেন তথাপি তাঁহার জীবনে এমন অনেক মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে যে জন্য তিনি আমাদের স্মৃতি-মন্দিরে চিরদিন অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

ইংরাজী ১৮৯৩ সালের জুন মাসে কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন ; সামান্য কয়েকটি টাকা পেন্সন স্বরূপ তাঁহার প্রাপ্য হইয়াছিল। পেন্সনের টাকা কয়টি সম্বল করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র গৃহে আসিলেন। আমরা তাঁহার শেষ জীবনের চিত্র যথাস্থানে অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইব। এক্ষণে তাঁহার জীবনে ও রচনায় পারসিক কবিদিগের প্রভাব কি পরিমাণে কার্য্য করিয়াছিল তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া সঙ্গত মনে হইতেছে। তিনি জীবনে এক দিনের জন্যও পারসিক কবিদিগের প্রভাব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। যশোহরে অবস্থান কালে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনায় মগ্ন হইলেও সূফী ধর্ম্মের প্রভাব তাঁহাকে একেবারে ত্যাগ করে নাই, পাঠক তাহার পরিচয় এই অধ্যায়ের অনেক স্থানেই পাইয়াছেন। সুতরাং সূফীধর্ম্ম ও সূফী-সাহিত্য তাঁহার জীবন ও চরিত্র গঠনের পক্ষে কি পরিমাণ সহায়তা করিয়াছে তাহা জানা নিতান্ত আবশ্যক।

সপ্তম অধ্যায়।



কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনে ও কাব্যে পারস্য দেশীয় কবিদিগের প্রভাব।

বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও ভাবগুলি যখন একটি সাহিত্যকে আশ্রয় করে তখনি সেই সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। ইংরাজী সাহিত্য যে এত শক্তিশালী তাহার কারণ উহার অন্তর্নিহিত সম্পদ ছাড়া আর কিছুই নহে। পৃথিবীর সকল দেশের সৎসাহিত্যই ইংরাজী সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। চীন দেশীয় সাহিত্য, জাপানী সাহিত্য, এমন কি জুলুদিগের ছড়া ও গান ইংরাজী সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। এই সুবিশাল বিশ্বের হৃৎস্পন্দন কোথায় কতটুকু শুনা গিয়াছে তাহা জানিবার জন্য ইংরাজী সাহিত্য অহর্নিশ উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

বঙ্গদেশের শেষ খাঁটি বাঙালী কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। বাঙালীর গৃহের ও সমাজের ছবি তিনি এমন করিয়া আঁকিয়া গিয়াছেন যে তাহা হইতে বাঙালী সমাজের ইতিহাসের একটি অধ্যায় অতি সহজেই রচিত হইতে পারে। বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় কবিগণই আমাদের দেশের প্রকৃত ইতিহাস-লেখক। যখন ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু হয় তখন কৃষ্ণচন্দ্র একবিংশতি বর্ষীয় যুবক। ঢাকায় অবস্থান কালে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য তর্কবাগীশের "রসরাজ" ও ঈশ্বর গুপ্তের "প্রভাকর" পাঠ করিতে করিতে কৃষ্ণচন্দ্রের কবিত্বশক্তির প্রকৃত উন্মেষ হয়। তাঁহার

বিখ্যাত সঙ্গীত "অয়ি সুখময়ি উষে কে তোমারে নিরমিল ?" সর্ব্বপ্রথম প্রভাকরে প্রকাশিত হইয়াছিল, এ কথা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেও তিনি ছোট খাট সঙ্গীতাদি রচনা করিয়াছিলেন।

যে সময়ে কবির লড়াই, অশ্লীল কবিতা ও ছড়ার বিপুল উপপ্লব বাঙ্‌লা সাহিত্যের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল সেই সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র পারস্য দেশীয় ভক্ত কবিদিগের নির্ম্মল প্রভাব আমাদের সাহিত্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দেন। বাঙ্‌লা সাহিত্যে তাঁহার স্থান কোথায় বুঝিতে হইলে সে সময়কার সাহিত্য ও সমাজের সহিত পাঠকের কতকটা পরিচয় থাকা আবশ্যক। প্রভাকর ও রসরাজের অশ্লীল বাক্‌যুদ্ধ পাঠ করিলে সে সময়কার রুচির পরিচয় কতকটা পাওয়া যায়। টেকচাঁদ ঠাকুরের "আলালের ঘরের দুলাল," মাইকেলের "একেই কি বলে সভ্যতা," "বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ", দীনবন্ধুর "লীলাবতী", "বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো," "যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ" প্রভৃতি পাঠ করিলে সে সময়ের সামাজিক অবস্থাও অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। সেই চারিদিককার দূষিত বায়ুর মধ্যে "সদ্ভাবশতকের" জন্ম নিতান্ত আশ্চর্য্যজনক হইয়াছিল। সমাজের সেই দূষিত অবস্থার মধ্যে সদ্ভাবশতক লবণাক্ত সমুদ্রের মাঝখানে সুমিষ্ট নির্ম্মল জলের উৎসের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল।*

"He was not all unhappy. His resolve
Upbore him, and firm faith, and evermore
Prayer from a living source within the will
And beating up thro' all the bitter world,
Like fountains of sweet water in the sea
Kept him a living soul.'

Enoch Arden.
Lord Tennyson.

বাঙলা সাহিত্যে যাঁহারা অন্যদেশীয় সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তা ও সর্ব্বোচ্চ ভাবসমূহ আনিয়া তাহাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র অন্যতম। এ কথার যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইলে আমাদিগকে সংক্ষেপে পারস্যদেশীয় কয়েকজন কবির জীবন ও কাব্যের পরিচয় লাভ করিতে হইবে। কৃষ্ণচন্দ্র নিজে কি পরিমাণে পারসিক সাহিত্যের ও পারসিক কবিদিগের প্রভাব লাভ করিয়াছিলেন তাহা না বুঝিলে তাঁহার কাব্যের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারা যাইবে না।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে পারস্য ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। ইহার ফলে পারস্য ভাষার কোনো শ্রেষ্ঠ কবির কাব্য তাঁহার অনধীত ছিল না। তিনি কিরূপ হাফিজ-ভক্ত ছিলেন তাহা সদ্ভাবশতক পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। অনেক কবিতার ভণিতা তিনি হাফিজের নাম ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু মজুমদার কবি যে শুধু হাফিজ পড়িয়াছিলেন তাহা নয়। পাঠক পরে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন। ফির্দৌসি, সাদী, ওমর খৈয়াম, জামি, জালালুদ্দিন রুমি প্রভৃতি পারস্যের অন্যান্য বাণিপুত্রগণও তাঁহার সখা ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের সহিত অন্তরে অন্তরে এমন সখ্য স্থাপন করিয়াছিলেন যে লৌকিক আচারে হিন্দু হইলেও অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে তিনি ভক্ত সূফী হইয়া উঠিয়াছিলেন। যে নিঃস্পৃহতা, যে নীরবতা ও ধর্ম্মোন্মত্ততা সূফীদিগকে জগতের কাছে দুর্ব্বোধ্য করিয়া রাখিয়াছে, সেই নিঃস্পৃহতা নীরবতা, ও ঈশ্বরানুরাগ তাঁহার জীবনে উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

যে সকল পারসিক কবির প্রভাব কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনে ও কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদের মধ্যে ফির্দৌসি, ওমর খৈয়াম, সাদী ও হাফিজের নাম প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য। কবি কৃষ্ণচন্দ্রের কাব্য আমাদিগকে পারস্যদেশীয় সুকুমার ভাব ও চিন্তা সমূহের অধিকারী

করিয়াছে। তাঁহারি কাব্যে আমরা পারস্যের কল্পনাকুঞ্জে প্রমুদিত পুরাতন, অথচ অক্ষয়সুরভি কতকগুলি গোলাপের পাপড়ি কুড়াইয়া পাইয়াছি। এই নিমিত্ত সংক্ষেপে কয়েকটি পারস্যদেশীয় কবির সহিত পাঠকের পরিচিত হওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। মজুমদার-কবির জীবনে ও কাব্যে যে সকল পারসিক কবির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদের মধ্যের কালের হিসাবে ফির্দৌসির নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। খোরাসানের অন্তর্গত মশ্‌হদ্‌ নামক স্থানে আনুমানিক ৯৪০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। গজনীর মাহমুদ তাঁহাকে কবিতায় পারস্যের ইতিহাস লিখিতে নিযুক্ত করেন এবং সে জন্য যথেষ্ট পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হন। এই কাব্যের কিছু কিছু উপকরণ পূর্ব্বেই সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু ইরাণ দেশের ইতিহাসটি যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় সে জন্য ফির্দৌসি কখনো পদব্রজে, কখনো উষ্ট্রপৃষ্ঠে সমগ্র পারস্যদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। কত পর্ব্বত, মরুভূমি, কত নগর ও জনপদ ঘুরিয়া উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি তাঁহার ইতিহাস রচনা শেষ করিলেন। যখন এই বিপুল শ্রমসাধ্য কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল তখন মাহমুদ তাঁহার অঙ্গীকৃত পারিতোষিক দিতে অস্বীকার করিলেন। ফির্দৌসি এই ঘটনা লইয়া একটি ব্যঙ্গ-কবিতা রচনা করেন। উহার ভাবার্থ এই—

রাজার তনয় হ'ত সে যদি ভূষিত
করিত মুকুটে আমার মাথা,
শোণিতে তাহার গরিমা নাহি,
বোঝে না সে বীরমর্ম্মের গাথা। *

"If this king had been the son of king, he would have
placed a crown of gold upon my head;
But as there is no nobility in his blood he is incapable
of heroic sentiments."

স্বভাবতঃই নিষ্ঠুর মাহমুদ তাহাতে উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করেন। বহু বৎসর নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইবার পর স্বীয় জন্মভূমির ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়া বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। মাহমুদ ফির্দৌসির স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া দূতহস্তে তাঁহার জন্য প্রচুর অর্থ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু হায়, দূত যখন মশ্‌হদের পথে প্রবেশ করিল তখন ফির্দৌসির মৃতদেহ কবরাভিমুখে চলিয়াছে। তিরস্কার পুরস্কার সকলি তাঁহার নিকট তখন সমান। তাঁহার ধর্ম্মশীলা কন্যার নিকট যখন সেই পারিতোষিক আনীত হইল তখন তিনি অবজ্ঞার সহিত সেই করতলগত সম্পদ প্রত্যাখ্যান করিলেন। কথিত আছে তিনি পরে এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সাধারণের হিতকল্পে তাহা ব্যয় করিয়াছিলেন।

একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পারস্যের অন্তর্গত নিশাপুর নামক স্থানে জ্যোতির্ব্বিৎ কবি ওমর খৈয়ামের জন্ম হয়। ওমরের "রুবা-ইয়াৎ" জগৎপ্রসিদ্ধ কাব্য গ্রন্থ। এই ওমর-প্রসঙ্গে একজন সুলেখক লিখিতেছেন,—"বাল্যকালে তাঁহারা তিন বন্ধু এক গুরুর নিকট শাস্ত্রা-ধ্যয়ন করিতেন। কথিত আছে তাঁহাদের গুরু সম্বন্ধে লোকের এই বিশ্বাস ছিল যে তাঁহার কাছে যাহারা ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিবে তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনে কীর্ত্তিমান হইবে। তদনুসারে বন্ধুত্রয়ের মধ্যে এই প্রতিজ্ঞাবন্ধন হইল যে তাহাদের মধ্যে যদি একজনও উচ্চ পদবী লাভ করে, তবে তাহার অংশে অপর দুইজন বঞ্চিত হইবে না। পরে যখন একজন পারস্যের কোনও সামন্ত নরপতির মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন ওমরকে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞামত তাঁহার নিকট ইচ্ছানুযায়ী প্রার্থনা করিতে কহিলে ওমর নিজের নির্জ্জন পল্লিবাস-

স্থানে একখণ্ড ভূমি ও সামান্য বাৎসরিক বৃত্তি ব্যতীত আর কিছুরই প্রার্থী হন নাই। এই ঘটনাতেই কবির প্রকৃত পরিচয় প্রথম পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি রাজধানীতে কোনও সম্মানের পদ, অধিকার বা ক্ষমতার জন্য লালায়িত হন নাই; তাঁহার ভিতর যে স্ফুটনোন্মুখ কবি-প্রতিভা এবং আত্ম-সমাহিত ধ্যান-প্রকৃতি সুপ্ত ছিল, তাহা অতি ধীরে অরুণায়মান কোন উষার প্রতীক্ষায় শান্ত পল্লীর শ্যামল ছায়ায় তাঁহার কুটির নির্দ্দেশ করিয়া দিল।" * এই ঘটনাটির মধ্যে ওমরের যে নিঃস্পৃহতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বাস্তবিকই কবিজনোচিত। প্রকৃতির নিভৃত নিকেতনে, ইরাণের স্নিগ্ধ দ্রাক্ষাকুঞ্জে, অনাবিল শান্তির ছায়ায় তাঁহার জীবন একটি সঙ্গীতের মত মূর্চ্ছনায় মূর্ছনায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া দিক্‌দিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছিল।

অনুমান ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে সিরাজ নগরে সাদীর জন্ম হয়। তাঁহার কবিতা বিখ্যাত পারসিক কবি ফির্দৌসি ও আনওয়ারির কবিতা অপেক্ষাও অধিক সমাদৃত হইয়া থাকে। 'গুলিস্তান' বা গোলাপকুঞ্জ ও 'বুস্তান' বা বাগান এই দুইখানি গ্রন্থে তাঁহাকে অমর করিয়াছে। তাঁহার গজলগুলি হাফিজের জগৎবিখ্যাত গজলের পরেই স্থান পাইয়া থাকে। ফির্দৌসি ও আনওয়ারি এই দুইজন কবির রচনায় যেরূপ ভক্তির উচ্ছ্বাস ও দুর্ব্বোধ্যতার প্রাবল্য, সাদীর রচনায় সেরূপ না হইলেও উহাতে ধর্ম্মভাব ও সাংসারিক জ্ঞান এ দুইয়েরই সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। এক কথায় দুর্ব্বোধ্যতা অপেক্ষা সাংসারিক জ্ঞানের কথাই উহাতে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ

* শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার লিখিত "জ্যোতির্ব্বিদ কবি ওমর খৈয়াম," শীর্ষক প্রবন্ধ।

মানসী, ১ম বর্ষ, ১৩১৫।

সাদীর 'গুলিস্তান' শুধু কাজের কথায় পূর্ণ বলিলেও হয়। সুফী কবিদিগের দুর্ভেদ্য রহস্যজাল তাঁহার কাব্যকে আচ্ছন্ন করে নাই। অতি শৈশব কালেই তাঁহার পিতৃমাতৃবিয়োগ হয়। বুস্তানের একটি কবিতায় তাহার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সাদী বহু স্থান পর্যাটন করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতাগুলি কাজের কথায় পূর্ণ, ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। তাঁহার নীতি অনেক স্থানে উচ্চশ্রেণীর নহে। গুলিস্তানের প্রথম গল্পটিরই উপদেশ এই যে, সন্তর্পণে মিথ্যা বলিয়া জয় লাভ করিতে পারিলে অনিষ্টকর সত্য বলিবার প্রয়োজন নাই। চতুর্থ গল্পটিতে সাদী বলিয়াছেন যে হাজার সুশিক্ষা পাইলেও মানুষ পিতৃপুরুষদিগের অভ্যস্ত দোষ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না। সাদীর বহুমুখীনতা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। একটা উদারতার ভাব তাঁহার রচনাগুলির সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিত মূর্খ সকলেরই পাঠযোগ্য সামগ্রী তিনি দিয়া গিয়াছেন। সাদী নিঃস্পৃহতার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। একবার তিনি উপহার স্বরূপ ৫০,০০০ দীনার পাইয়া ছিলেন, কিন্তু নিঃস্পৃহ কবি সেই সমুদয় অর্থ ব্যয় করিয়া অতিথিদিগের জন্য একটী পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার উক্তিও তাঁহার কার্য্যের অনুরূপ,—

"The man of God with half a loaf content,
To dervishes there mnant will present."

অর্থাৎ "যে ঈশ্বরপরায়ণ সে আধপেটা খাইয়া তাহার সর্ব্বস্ব সাধু সন্ন্যাসীকে দান করে।" এ কথা সাদীর নিজের সম্বন্ধে যেমন খাটে এমন আর কাহারও সম্বন্ধে তেমন খাটে না। একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সাদীর অনেক কবিতা বা কবিতাংশ হাফিজের রচনার মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। সাদী হাফিজ

হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপ বলা যায় না, কারণ হাফিজ সাদীর পরবর্ত্তী কালের কবি। যদি কেহ কাহারও কাছে ঋণী হন তবে হাফিজকেই সাদীর নিকট ঋণী বলিতে হইবে। কথিত আছে তিনি শত বৎসরের অধিক কাল জীবিত ছিলেন। যখন তিনি গুলিস্তান লেখেন তখন তাঁহার বয়স আশী হইতে নব্বইয়ের মধ্যে ছিল। এরূপ বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার রচনা শক্তি লুপ্ত হয় নাই।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সিরাজ নগরে হাফিজের জন্ম হয়। সদ্বংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। কবিপ্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করায় বাহিরের আড়ম্বর ও সম্মান তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। প্রথম যৌবনে তাঁহার বন্ধুবান্ধব জুটিয়াছিল, আমোদপ্রমোদেও তাঁহার অনুরক্তি জন্মিয়াছিল।

সাকী নবাৎ (ইক্ষুদণ্ডের শাখা) নাম্নী এক সুন্দরী কুমারী তাঁহাকে পাগল করিয়াছিল। মুজাফ্ফার বংশীয় এক রাজকুমার উক্ত সুন্দরীর হৃদয় জয় করিবার জন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। সিরাজ নগরের নিকটে পিরি সেব্জ নামক একটি স্থান ছিল। এইরূপ প্রবাদ ছিল যে, যে কোন যুবক সেই স্থানে চল্লিশ রাত্রি অনিদ্রায় যাপন করিতে পারিবে সে-ই বিখ্যাত কবি হইবে। হাফিজ চল্লিশ রাত্রি সেই স্থানে অনিদ্রায় কাটাইলেন। নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে হাফিজ পূর্ব্বোক্ত সুন্দরীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। গৃহের বাতায়ন উন্মুক্ত হইল, সুন্দরী সেই বাতায়ন-পথে আবির্ভূত হইয়া জানাইলেন তিনি রাজপুত্র অপেক্ষা কবির অধিক পক্ষপাতী। এই সুন্দরী কুমারীর প্রেমে হাফিজ এতদূর পাগল হইয়াছিলেন যে একটি কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন,—"সিরাজের সেই তুর্কীকুমারী যদি আমার হৃদয় গ্রহণ করে তাহা হইলে আমি তাহার কালো

তিলটির জন্য সমগ্র বুখারা ও সমরকন্দ দিতে প্রস্তুত আছি।" পরবর্ত্তী জীবনে হাফিজের প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইয়া তিনি কঠোর সংযমের সহিত জীবন যাপন করিয়াছিলেন। বাগদাদের রাজা সুলতান আহমদ ইলখানি প্রচুর অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে বাগদাদে স্বীয় রাজসভার কবি হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ফকির ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহচর্য্য ত্যাগ করিয়া রাজ প্রাসাদের ঐশ্বর্য্যের ক্রোড় আশ্রয় করিতে কোনমতে স্বীকৃত হন নাই। দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজা মাহমূদ সাহ বাহমণি হাফিজকে একবার সাদর নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। হাফিজ অরমাজ পর্য্যন্ত স্থলপথে গিয়া দাক্ষিণাত্যরাজের পোতে উঠিলেন। কিন্তু সমুদ্রপথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই তাঁহার এমন সমুদ্র-পীড়া উপস্থিত হইল যে তাঁহাকে জাহাজে রাখা দুষ্কর হইয়া উঠিল। অবশেষে তাঁহাকে তীরে নামাইয়া দিতে হইল। অসুস্থ দেহে তিনি সিরাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাজ-সভা তাঁহার জীবনে সহিত না। হাফিজ সূফী ছিলেন, সুতরাং কোরাণের লৌকিক ব্যবহারের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। মসজিদ ও গির্জ্জা উভয়ই তাঁহার পক্ষে সমান ছিল। একমাত্র চিরন্তন, অন্য-নিরপেক্ষ পুরুষের সত্তাতে তিনি আস্থাবান্ ছিলেন। ১৩৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত হয়। সিরাজ নগরের অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র উদ্যানে তাঁহার দেহ সমাহিত করা হয়।

পারসিকগণ মোহম্মদের যে সকল মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন সেইগুলির উপরই সূফীমত প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের বেদান্ত দর্শনকেও তাঁহারা কতকটা অনুকরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। পারস্যদেশীয় সূফীদিগের এই বিশ্বাস যে সৃষ্ট আত্মা ও স্রষ্টা ইঁহাদের

মধ্যে একটি প্রতিজ্ঞাবন্ধন আছে; স্রষ্টা হইতে যখন মানবাত্মার পৃথক অস্তিত্ব আরম্ভ হয় তখন এক স্বর্গীয় স্বরে এই প্রশ্ন হইয়াছিল, "তোমরা কি পবিত্র ও গম্ভীর প্রতিজ্ঞাবন্ধনে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত নহ ?" তদুত্তরে সৃষ্ট আত্মাসকল সমস্বরে বলিয়া ছিল, "হাঁ, আমরা যুক্ত !" এই নিমিত্তই সূফী কবিদিগের দুর্ব্বোধ কবিতা সমূহের অনেক স্থানে 'নিস্তি ?' অর্থাৎ 'তুমি নও ?' এবং 'বেলি' অর্থাৎ 'হাঁ', এই শব্দ-দ্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। সূফীগণ দীর্ঘকাল জ্ঞান ও নীতিশিক্ষার দ্বারা আত্মার ক্রমোন্নতি সাধন করে। পূর্ণ জ্ঞান ও শান্তি লাভই ইঁহাদের চরম লক্ষ্য। সূফী কবিদিগের মধ্যে হাফিজ অন্যতম একথা পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

যে কয়জন পারসিক কবির প্রভাব প্রধানতঃ কৃষ্ণচন্দ্রকে গঠিত করিয়াছিল তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সমাপ্ত হইল। ইঁহাদের পরি-চয় পাঠকের নিকট স্থানে স্থানে ধান ভাণিতে শিবের গীতের মত লাগিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের কাব্য ও বঙ্গীয় কবি-সমাজে তাঁহার স্থান কোথায় তাহা বুঝিতে হইলে এই পরিচয়-ব্যাপার অপরি-হার্য্য। উক্ত কবিগুলির জীবন সমষ্টিভাবে দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে নিঃস্পৃহতা তাঁহাদের পক্ষে অযত্নসম্ভূত গুণের মধ্যে ছিল। ঐশ্বর্য্য, রাজ-সম্মান প্রভৃতিকে তাঁহারা অনায়াসেই তুচ্ছ করিতে পারি-তেন। তাঁহাদের আত্মসম্মানবোধ কোথাও আহত হইলে তাঁহারা সময়ে সময়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিতেন। ভগবদ্ভক্তিতে তাঁহারা পাগল হইতেন। কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন ও চরিত্রে সূফী কবি-দিগের এই সকল ও অন্যান্য দোষ গুণ কি পরিমাণে সংক্রামিত হইয়াছিল তাহা আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

উল্লিখিত পারসিক কবিদিগের জীবনে যেরূপ নিঃস্পৃহতার পরি-

চয় পাওয়া যায়, কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনেও সেইরূপ নিঃস্পৃহতার পরিচয় অসংখ্যবার পাওয়া গিয়াছে। নিঃস্পৃহতা তাঁহার পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। যশোহরে অবস্থান কালে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন সে কথা অবশ্যই পাঠকের স্মরণ আছে। শিক্ষকদিগের প্রাপ্য পুরস্কার তিনি গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। গৃহেও তাঁহার এ প্রকৃতির ব্যতিক্রম হইত না। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র উমেশচন্দ্রের ছাত্রাবস্থাতেই বিবাহ হইয়াছিল। উমেশচন্দ্রের শ্বশুরালয় হইতে জামতার জন্য মাসিক কিছু বৃত্তি আসিত। বৃত্তির টাকা কৃষ্ণচন্দ্রের নামেই আসিত। কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং সে অর্থের এক পয়সাও লইতেন না। একবার এক বৎসর পূর্ণ হইয়া গেলে কৃষ্ণচন্দ্র হিসাব করিয়া দেখিলেন সম্বৎসরে প্রাপ্ত অর্থ হইতে উমেশচন্দ্রের হিসাবে কিছু উদ্বৃত্ত আছে। তিনি সেই উদ্বৃত্ত অর্থ উমেশচন্দ্রের শ্বশুরালয়ে মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের বৈবাহিক বাটীর সকলে অবাক হইয়া গেলেন। আর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কৃষ্ণচন্দ্রের কোনো কুটুম্ব বাড়ী হইতে প্রতি বৎসর এক কলসী গুড় আসিত। একবার ঘটনাক্রমে মৃত্তিকামিশ্রিত গুড় আসিয়াছিল। কুটুম্বগণ কোনরূপে সেই সংবাদ পাইয়া লজ্জিত হন ও পুনরায় এক কলসী উত্তম গুড় পাঠাইয়া দেন। যখন সেই গুড়ের কলসী আসিয়া উপস্থিত হইল তখন কৃষ্ণচন্দ্র গৃহে ছিলেন। তিনি যখন দ্বিতীয় বার গুড় আসিবার কারণ শুনিলেন তখন বলিলেন, "যাহা 'একবার দিবার কথা তাহা কখনই দুইবার লওয়া যাইতে পারে না।" পুরমহিলাগণ যখন জানাইলেন বাটীর বধূমাতা গুড় ভালবাসেন তখন কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন, "বেশ, আমি গুড় কিনিয়া দিব।" কুটুম্ববাড়ীর গুড় তখনকার মত

ফিরাইয়া দেওয়া হইল, পরে মজুমদার মহাশয় স্নান করিতে গেলে যে ব্যক্তি গুড় আনিয়াছিল সে গোপনে পুরমহিলাদের নিকট গুড়ের কলসীটি রাখিয়া পলায়ন করিল। স্ফী কবিদিগের এই অলৌকিক নিঃস্পৃহতা গুণ তাঁহার চরিত্রে অতি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

স্ফী কবিদিগের স্বভাব সুলভ জিদ ও প্রতিহিংসার ভাবও তাঁহার চরিত্রে স্থান পাইয়াছিল। এ জিদ ও প্রতিহিংসার ভাবের মূল কোথায় তাহা অনেক সময়ে বুঝিতে পারা যায় না। স্বীয় জিদের জন্যই তিনি যশোহরে অস্থায়ীভাবে পদচ্যুত হইয়াছিলেন। সেন-হাটিতে অবস্থান কালে তিনি প্রতি দিন ভৈরবের জলে হস্ত মুখ প্রক্ষালন ও স্নান করিতেন। জনৈক রজক একদিন তাঁহার নির্দ্দিষ্ট অবতরণিকায় কাপড় কাচিয়াছিল, তাহাতে তিনি ভয়ানক কুপিত হন ও তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে বলেন। সে বারবার এরূপ আদিষ্ট হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে কোন উত্তর না দিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরে যাইতে বলিলেন এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে উক্ত স্থান ত্যাগ না করিয়াছিল ততক্ষণ তাহার উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়াছিলেন। আর একবার তাঁহার এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে বিবাহ উপলক্ষে বাদ্য বাজিতেছিল এজন্য তিনি কুপিত হন। স্বভাবতঃই তিনি একটু শান্তিপ্রিয় ছিলেন, কোলাহল তাঁহার নিকট বিষবৎ মনে হইত। তিনি বারবার উক্ত প্রতিবেশীকে বাদ্য বন্ধ করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হইল না, তখন তিনি নিজ ব্যয়ে নাকাড়া বাদ্য বসাইলেন। নাকাড়া বাদ্যের ধ্বনি অত্যন্ত ভীষণ। সেই বাদ্য বসাইবা মাত্র প্রতিবেশীর বাড়ীর মঙ্গলসূচক বাদ্যধ্বনি ডুবিয়া গেল, প্রবল নাকড়া বাদ্য সমগ্র গ্রামকে কাঁপাইয়া তুলিল। কৃষ্ণচন্দ্র নিতান্ত শান্ত

ও নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন কিন্তু তাহা সত্বেও সময়ে সময়ে তাঁহার প্রকৃতিতে সূফী কবি-প্রকৃতিসুলভ অন্তর্নিহিত প্রতিহিংসার ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িত।

কৃষ্ণচন্দ্রের যৌবনকালে দেশে সুরাপানের বিশেষ প্রচলন ছিল, কিন্তু তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী হওয়ায় প্রথমে সুরার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল ; কিন্তু পরে সুরা তাঁহাকে মজাইয়াছিল। দেশের তখনকার হাওয়াই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। পারসিক কবিগণের প্রভাব তিনি এ বিষয়ে লাভ করিয়াছিলেন কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, কারণ সূফী কবিদিগের দ্রাক্ষারসোচ্ছ্বসিত পেয়ালার এমনি একটা মোহ আছে যে তিনি তাহার প্রভাব একেবারে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন কি না তাহা বলা বড় কঠিন।

এবার তিনি পারসিক কবিদিগের রচনার প্রভাব কি পরিমাণে লাভ করিয়াছিলেন তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। পূর্ব্বে যে সকল কবির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে সাদীর রচনার প্রভাব কৃষ্ণচন্দ্রের কাব্যে যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণচন্দ্র হাফিজের বিশেষ ভক্ত ছিলেন, তাঁহার রচনা হইতেও তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক সময়ে সাদীর চিন্তা-মুকুলও তাঁহার রচনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। হাফিজ তাঁহাকে পাগল করিতেন, সাদী তাঁহাকে শান্ত করিতেন। যাহা হউক আমরা এক্ষণে সাদী ও কৃষ্ণচন্দ্রের রচনার সাদৃশ্য দেখাইতে চেষ্টা করিব। কৃষ্ণচন্দ্র "রহস্য" শীর্ষক কবিতায় লিখিতেছেন—

"মনের যে গূঢ় ভাব গোপনের হয়,
মিত্রকেও বলা তাহা সমুচিত নয়।

তোমার রহস্যে স্নেহ তোমার যেমন,
স্মরণ রাখহ, নাই অন্যের তেমন।
তুমি যদি সে রহস্য বল কোন জনে,
কি বিশ্বাস, সে যে তাহা রাখিবে গোপনে।
আগে কিছু না করিয়া বিচার অন্তরে,
গোপনের কথা সব বলিয়া অপরে।
"বল না, বল না" পরে বলা শতবার
এর চেয়ে হাসির বিষয় নাই আর।" ইত্যাদি।

সাদী বলিতেছেন,—

"Better be silent, than thy purpose tell,
To others and enjoin to secrecy.
O dolt ! keep back the waters at the well,
For the swollen stream to stop, thoul't vainly try.
In private utter not a single word,
Which thou in public wouldst regret were heard."

অর্থাৎ অন্যকে তোমার মনের কথা বলিয়া পরে তাহাকে উহা গোপন রাখিবার জন্য অনুরোধ করা অপেক্ষা পূর্ব্ব হইতেই নীরব থাকা ভাল। মূর্খ! কূপের জল কূপেই রাখ, কারণ উচ্ছ্বসিত নদীর জলকে থামাইবার চেষ্টা তোমার পক্ষে বৃথা হইবে। গোপনে এমন একটি কথাও বলিও না যাহা প্রকাশ্যে বলিলে পরে তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে।

"সাধু ও নীচ" শীর্ষক কবিতায় কৃষ্ণচন্দ্র বলিতেছেন—

"ঘটে যদি সাধুর দীনতা অতিশয়,
আদর গৌরব তাঁর কমিবার নয়।

নীচে যদি ধনী হয় কুবের সমান,
বাড়ে না কখন তার গৌরব সম্মান।
পড়েছে যে মহামণি পঙ্কের ভিতরে,
বল তারে কোন্ জন অনাদর করে?
বায়ূত্থিত আকাশের ধূলি সমুদয়,
বল বল কার কাছে মাননীয় হয়?"

সাদী তাঁহার গুলিস্তানে বলিয়াছেন—

"Although a gem be cast away
And lie obscure in heaps of clay,
Its precious worth is still the same.
Although vile dust be whirled to heaven
To such no dignity is given
Still base as when from earth it came."

অর্থাৎ যদি মুক্তাকে দূরে ফেলিয়া দেওয়া হয় ও উহা কর্দ্দম রাশির মধ্যে অনাদরে আবৃত হইয়া থাকে তথাপি উহার মূল্য কিছুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। যদি জঘন্য ধূলিরাশি বাতাস দ্বারা তাড়িত হইয়া আকাশে উত্থিত হয় তাহা হইলেও উহা পূর্ব্ববৎ ঘৃণিতই থাকে, উহার কোনরূপ সম্মান বৃদ্ধি হয় না।

এখানে সাদৃশ্য প্রায় অনুবাদে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

"ধনীর প্রতি" শীর্ষক কবিতায় কবি বলিতেছেন,—

"ওহে রম্য হর্ম্ম্যবাসী ধনাঢ্য প্রধান!
ধনী বলে করোনাক মনে অভিমান।
এ ধন ত চিরদিন কভু তব নয়,
রাখিতে নারিবে ধন নিধন সময়।

এই যে ভবন তব শোভার ভাণ্ডার
এতেই ত্যজিবে তব প্রাণ দেহাগার।
যে দ্বারে রেখেছ তুমি দ্বারী বসাইয়া,
আসিবে কালের দূত এই দ্বার দিয়া।
বলবান প্রতিহারী এই যে তোমার,
নারিবে করিতে বল নিকটে তাহার।
রাখ তুমি দ্বারে দিয়া লোহার অর্গল,
সে কালে অর্গলে নাহি হবে কিছু ফল।" ইত্যাদি।

সাদী বলিতেছেন,—

"The world, my brother, will abide by none
By the world's Maker let thy heart be won,
Rely not, nor repose on this world's gain,
For many a son like thee, she has reared and slain.
What matters when the spirit seeks to fly,
If on a throne, or on bare earth we die?"

অর্থাৎ ভাই এ দুনিয়া কাহারো চিরদিনের মত নহে; দুনিয়ার মালিকের নিকট ধরা দাও; এ পৃথিবীর লাভের উপর বিশ্বাস বা নির্ভর স্থাপন করিও না, কারণ তোমার ধাত্রী তোমার মত অনেক সন্তানকে লালন পালন করিয়া আবার স্বহস্তেই তাহার বিনাশ সাধন করিয়াছেন। যখন তোমার মৃত্যু নিশ্চিত তখন সিংহাসনের উপর কিংবা খোলা মাটির উপর যেখানেই তোমার মৃত্যু হউক না কেন, তাহাতে কিছুই আসে যায় না।

"ভিক্ষা" শীর্ষক কবিতায় কৃষ্ণচন্দ্র বলিতেছেন,—

"এই তুচ্ছ অন্ন বস্ত্রে তুষ্ট রও মন,
কার কাছে কোন কিছু মেগনা কখন।

আপন যতনে লাভ যখন যা হয়,
যাচিত রতন তার তুল্য মূল্য নয়।
যদ্যপি বল্কল পর রহ উপবাসী,
হও না হও না তবু পরের প্রত্যাশী।
চা(ও)য়া কিছু অপরের মুখপানে চেয়ে,
না খেয়ে পরাণে মরা ভাল তার চেয়ে।"

সাদীও ঐ কথাই বলিতেছেন,—

"Better renounce the favour of the great,
Than meet their porter's gibes at their expense,
Better through want of food succumb to fate,
Than bear the butcher's dunning insolence."

অর্থাৎ ধনীর দ্বারবানের বিদ্রূপের পাত্র হওয়া অপেক্ষা ধনীর অনুগ্রহ লাভের আশা ত্যাগ কর। নিষ্ঠুর লোকের বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা সহ্য করা অপেক্ষা অনাহারে প্রাণত্যাগ করা বরং শ্রেয়ঃ। অন্যত্র—

"Miserable is that supply of food which thou obtainest in the hour of need; the pot is put to boil, but my reputation is bubbled into vapour. He added to my means of subsistence, but took from my reputation; absolute starving were better than the disgrace of begging."

অর্থাৎ অভাবের সময় তুমি যে অন্ন যাচ্ঞা দ্বারা লাভ কর তাহা নিতান্তই ঘৃণিত; হাঁড়ি উনানে চড়ানো হয় কিন্তু তাহাতে আমার সম্মান বাষ্পীভূত হইয়া যায়।—দাতা আমার জীবন ধারণের জন্য আবশ্যক সামগ্রী যোগান দিয়া আমার সম্মান অপহরণ করে; ঘৃণিত ভিক্ষাবৃত্তি অপেক্ষা অনাহারজনিত মৃত্যু শ্রেয়স্কর।

সম্ভাবশতকের "অন্যের দুঃখ দেখিলে তোমার দুঃখ দূর হইবে" শীর্ষক কবিতার নিম্নোদ্ধৃত অংশ—

"একদা ছিলনা জুতো চরণ যুগলে
দহিল হৃদয়বন সেই ক্ষোভানলে।
ধীরে ধীরে চুপি চুপি দুঃখাকুল মনে,
গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে।
দেখি তথা একজন পদ নাই তার,
অমনি জুতোর খেদ ঘুচিল আমার।"

এবং সাদীর একটি রচনার ইংরাজী অনুবাদ একত্রে পাঠ করুন—

"I had never complained of the vissicitudes of fortune, nor murmured at the ordinances of Heaven, excepting on one occasion, that my feet were bare and I had no wherewithal to shoe them. In this desponding state I entered the metropolitan mosque at Cabah and there I beheld a man that had no feet. I offered up prayer and thanksgiving for God's goodness to myself, and submitted with patience to my want of shoes."

কৃষ্ণচন্দ্রের "প্রবাসীর জন্মভূমি দর্শন" শীর্ষক কবিতা যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা তাহার সঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি পাঠ করিলে উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন।

"Tell me gentle traveller thou
Who hast wandered far and wide,
Seen the sweetest roses blow
And the brightest rivers glide,
Say of all thy eyes have seen
Which the fairest and has been ?

Lady! shall I tell thee where
Nature seems most blest and fair,
Far above all climes beside?
'Tis where those we love abide.
And that little spot is best
Which the lov'd one's foot has pressed.

Though it be a fairy space,
Wide and spreading is the place;
Though 'twere but a barren mound,
'Twould become enchanted ground.
With thee yon sandy waste would seem
The margin of Al-Kawthar's stream.
And thou canst make a dungeon's gloom
A bower, where new-born roses bloom."

অর্থাৎ হে ধীর পথিক! তুমি তো বহু দূর দূরান্তর অবধি ভ্রমণ করিয়া মিষ্টতম গোলাপের বিকাশ স্থান ও সব চেয়ে সুন্দর নদী সমূহের প্রবাহ দেখিয়াছ; তুমিই বল যত দেশ তুমি দেখিয়াছ তাহার মধ্যে কোন্ দেশ সব চেয়ে সুন্দর? (১ম শ্লোক) ভদ্রে! অন্যান্য দেশের তুলনায় কোন্ দেশে আমার কাছে প্রকৃতি সব চেয়ে কল্যাণময়ী ও মনোহারিণী মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছেন তাহা কি সত্য বলিব? সে স্থান যেখানে আমাদের প্রিয়জনেরা বাস করেন আর যে স্থানে আমাদের প্রিয়জনের পদধূলি পড়িয়াছে সেই স্থানই সব চেয়ে ভাল। (২য় শ্লোক) ইহা যদি পরীস্থান হয় তথাপি উহা বিস্তৃত; যদি উহা অনুর্ব্বর বন্ধুর ভূমি হয় তথাপি উহার মন্ত্রশক্তি থাকিবে! মরুভূমিতে যদি তুমি সঙ্গে থাক তাহা হইলে উহা আল্ কথারের নদীতীরের ন্যায় রমণীয় হইবে, এবং অন্ধকার গৃহে যদি তুমি অবস্থান কর তবে উহা

সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপসমূহে আচ্ছন্ন কুঞ্জগৃহের শোভা ধারণ করে। (৩য় শ্লোক)।

কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনে হাফিজের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি হাফিজই তাঁহাকে পাগল করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যের সর্ব্বত্রই হাফিজের প্রভাব লক্ষিত হয়, হাফিজ তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছিলেন। বিশেষ বিশেষ স্থানে যেমন সাদী ও তাঁহার রচনার মধ্যে নিকট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় হাফিজের সহিত তাঁহার সেরূপ সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না, তাহার কারণও পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। হাফিজ তাঁহাকে পাগল করিতেন, সাদী তাঁহাকে শান্ত করিতেন। তথাপি হাফিজ ও তাঁহার মধ্যে সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য দুই এক স্থান হইতে উদ্ধৃত করা গেল। কৃষ্ণচন্দ্র লিখিতেছেন—

"যখন যেখানে করি সময় যাপন
সুধামৃত পানে নহি বঞ্চিত কখন;
যে সুখ রতনে পূর্ণ আমার এ মন,
রাজার ভাণ্ডারে নাই সে সুখ রতন।"

হাফিজ বলিতেছেন—

"Hafiz abjures the royal court,
Let him have but content and health,
For what to him can gold import
Who scorns the paths of worldly wealth?"

অর্থাৎ হাফিজ রাজসভা চায় না; সে স্বাস্থ্য, আর সন্তোষ পাইলেই সুখী। যে পার্থিব ঐশ্বর্য্য অবহেলা করে তাহার কাছে সুবর্ণের কোনই মূল্য নাই।

কৃষ্ণচন্দ্রের "প্রবাসীর জন্মভূমি দর্শন" কবিতার নিম্নোদ্ধৃত অংশ ও

হাফিজের রচনা একত্রে পাঠ করিলে পাঠক উভয়ের মধ্যে একটি সুন্দর ভাবসাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন ; সে ভাবসদৃশ্য অনুকরণপীড়িত বা ম্লান নহে ; উহা আপনার স্বাতন্ত্র্যে ও মাধুর্য্যে আপনি মহিমান্বিত।

"এই ত সে প্রিয়তম মম জন্মস্থান,
যার তরে ছিল সদা ব্যাকুলিত প্রাণ ;
যার প্রীতিময়ী মূর্ত্তি চারু দরশন,
করিতাম এতদিন চিন্তা অনুক্ষণ ;
আজ তার সেই মূর্ত্তি নিরখি নয়নে,
মরি কি বিমল সুখ উপজিল মনে !
কাদম্বিনী বরষার সময়ে যেমন,
নিয়ত সলিলে করে ভূতল সিঞ্চন ;
আজ এ জনমভূমি আমার তেমন
করিছে অন্তরে কত সুখ বরষণ।
অথবা তপন আভা প্রভাত সময়
যেরূপ প্রফুল্ল করে সরোজ নিচয় ;
জনমভূমির কান্তি আজ সে প্রকার
হৃদয় কমল ফুল্ল করিছে আমার।
কত কত রম্য স্থান করেছি ভ্রমণ,
হেরিয়াছি কত শত নগর শোভন।
কিন্তু তাহাদের সেই সুষমা নিচয়
আজ এ রূপের কাছে ছার-জ্ঞান হয়।"

হাফিজের রচনা ইহার সহিত পাঠ করুন—

"Can all the gold the world bestows,
Though pour'd by fortune's bounteous hand,

Repay me for the joys I lose,
The breezes of my native land ?"

ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হইয়া সমগ্র পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য আমাকে ঢালিয়া দেয় তথাপি আমার জন্মভূমির বাতাসে যে আনন্দ আছে তাহা দিতে পারে না।

"My friends exclaimed, "Oh stay at home,
Nor quit this once beloved spot ;
What folly tempts thee thus to roam—
To quit Shiraz—desert thy cot ?"

আমার প্রিয়জনগণ বলিয়াছিল, "গৃহে থাক, এই প্রিয় স্থান ত্যাগ করিও না ; কিসে তোমাকে তোমার এই কুটির, এই সিরাজ ত্যাগ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে প্রলুব্ধ করে ?"

"Yon royal court will ill repay,
Though all its gorgeous wealth be given,
The blessing which thou cast away,
Health and content the gifts of Heaven."

ঐ রাজ-সভার সমুদয় ঐশ্বর্য্যও যদি তুমি পাও তথাপি যে স্বর্গের দান স্বাস্থ্য ও সন্তোষ তুমি হারাইতে বসিয়াছ তাহা আর ফিরিয়া পাইবে না।

"অনিত্যতা" শীর্ষক কবিতায় কৃষ্ণচন্দ্র বলিতেছেন,—

"তাই বলি রে হাফিজ ! শুনহ বচন,
অনিত্য বিষয়ে মুগ্ধ হওনা কখন।
নিত্য নিরাময় যিনি জগৎ কারণ,
জনম যাঁহার নাই, নাহিক মরণ,

সেই নিত্য সত্য হৃদে করহ স্থাপন,
শোক তাপ মনোকষ্ট রবে না কখন।"

হাফিজ বলিতেছেন—

"Hafiz! if thou desire the presence (union with God Most High) from him be not absent:
When thou visitest thy Beloved, abandon the world and let it go."

হাফিজ, যদি তুমি তাঁহার বর্ত্তমানতা অনুভব করিতে চাও তবে তাঁহা হইতে দূরে থাকিও না। যখন তুমি তোমার প্রিয়তমের দর্শন লাভ কর তখন জগৎ ভুলিয়া যাও এবং ইহাকে ত্যাগ কর।

কৃষ্ণচন্দ্র লিখিতেছেন—

"কি কারণ, দীন, তব মলিন বদন?
যতন করহ লাভ হইবে রতন।
কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ?
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ?
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?
মনে ভেবে বিষম বিরহ-রিপু ভয়,
হাফেজ বিমুখ কেন করিতে প্রণয়?"

ইঁহার সহিত হাফিজের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দুইটি পাঠ করুন—

Hafiz! grieve not of the (cruel) autumn wind (which bloweth) in the sward of the world:
Exercise reasonable thought. The rose (time) without the thorn (the autumn wind) is where?"

এবং

"Hafiz ! be patient. For, in the path of being a lover,
whoever gave not his life (for the Beloved)
to the Beloved,—arriveth not."

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। যে উদ্দেশ্যে এই সকল পাঠ উদ্ধার করা গিয়াছে সে উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহাতেও যাঁহার তৃপ্তি না হইবে তিনি মূল পারস্য কবিতা এবং কৃষ্ণচন্দ্রের কবিতা একত্রে পাঠ করিয়া দেখিবেন, তাঁহাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর হইবে।

পারসিক কবিদিগের যে সকল দোষগুণ কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার আলোচনা করা গিয়াছে। কাব্যের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিয়া এই অধ্যায় শেষ করা যাইতেছে।

সাদীর কবিতায় উপদেশের মাত্রা অত্যন্ত অধিক। এই নীতি-শিক্ষার চেষ্টাই অনেক স্থানে সাদীর কবিতার কবিত্ব এমন কি সাধারণ সৌন্দর্য্যও নষ্ট করিয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্রের কবিতাতেও উপ-দেশের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সাদীর চেয়ে সে চেষ্টা অনেকটা প্রচ্ছন্ন বলিয়া মনে হয়। অনুবাদ বা অনুসরণে কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক এই উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। সাদীর কবিতায় বহুস্থানে সাংসারিক জ্ঞান (worldly wisdom) শিক্ষা দিবার একটা চেষ্টা বেশ অনুভব করিতে পারা যায়; এই সাংসারিক জ্ঞান শিক্ষা দিবার চেষ্টা কৃষ্ণচন্দ্রের কবিতাতেও স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়; তবে সাদীর কবিতায় স্থানে স্থানে যেরূপ বিকট সাংসারিক জ্ঞান শিক্ষা দিবার চেষ্টা আছে কৃষ্ণচন্দ্রের কবিতায় তাহা দেখিতে

পাওয়া যায় না। সাদীর গুলিস্তানের প্রথম আখ্যায়িকাটি বিচার করিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। উহার নীতি এই যে যদি সতর্কভাবে একটি মিথ্যা কথা বলিয়া অব্যাহতি পাওয়া যায় তাহা হইলে অপ্রিয় সত্য অপেক্ষা উহাকেই অধিক সমাদর করিবে।" বলা বাহুল্য কৃষ্ণচন্দ্রের কবিতায় এইরূপ বিকট সাংসারিক জ্ঞান শিক্ষা দিবার চেষ্টা কোথাও পরিলক্ষিত হয় নাই। সাদীর কবিতায় স্থানে স্থানে অশ্লীলতা দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষ্ণচন্দ্র সে দোষ সর্ব্বৈব পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাতেও তিনি কাব্যের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। হাফিজের প্রেম অনাবিল, নিষ্কলঙ্ক; কিন্তু তাহার মধ্যে একটা উদ্বেল ভাব আছে। সেই উদ্বেল ভাব কৃষ্ণচন্দ্রের রচনায় আমরা দেখিতে পাই না। হাফিজ যেখানে কথা বলিয়াছেন সেইখানেই তিনি অবাধে, পরিপূর্ণ হৃদয়ে কথা বলিতেছেন ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের রচনায় সর্ব্বত্র এই অবাধ পরিপূর্ণতার ভাব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। মোটের উপর আমরা দেখিতে পাই যে সাদীর প্রভাব লইয়া তিনি তাঁহার ভাবের অনেক স্থানে উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, হাফিজের প্রভাব লইয়া তিনি তাঁহার অস্বাভাবিক উদ্বেল ভাবকে অনেকটা সংযত করিয়া, কেবল মাত্র ভগবদ্ভক্তের আপাতদৃষ্টিতে অসম্বদ্ধ প্রলাপবাণী হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া লোক সাধারণের কাছে উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি সাদী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি, হাফিজ অপেক্ষা তাঁহাতে সাধারণ মানবস্থলভ ভাব অধিক বর্ত্তমান। তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের সাধনা যে অবধি হাফিজের সহিত মিলিয়াছে তিনি ততটুকুই অগ্রসর হইয়াছেন; তিনি নিজে যে গ্রামে পৌঁছিয়াছেন সেই গ্রামের কথাই বলিয়াছেন, তাহাতে হাফিজের সহিত তাঁহার যাহা মিলিবার তাহা

মিলিয়াছে, যাহা মিলিবার নয় তাহা মিলাইবার জন্য কৃষ্ণচন্দ্র কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তিনি বাঙলা দেশের সাদী বলিলে ঠিক হইবে না, তাঁহাকে বাঙলা দেশের হাফিজ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে; এই উভয় কবির মাঝখানে যদি কোনো তৃতীয় কবির আসন থাকে তবে তাহা কৃষ্ণচন্দ্রেরই প্রাপ্য। আর বাঙলা দেশের কাব্য-সাহিত্যে তিনি তাঁহার নিজের ক্ষেত্রে এখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া রহিয়াছেন। পারস্যের এই কণ্টকসমাকীর্ণ গোলাপকুঞ্জে প্রবেশ করিতে তিনিই আমাদের প্রথম ও আজ পর্য্যন্ত প্রধান সহায় হইয়া রহিয়াছেন; সুতরাং শুধু এই দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলেও তাঁহার নিকট আমাদের ঋণ যে কত গভীর তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। তাঁহার অনুবাদ ও অনুসরণ সকল স্থানেই যে মনোজ্ঞ হইয়াছে এ কথা বলিতে পারি না, কিন্তু সেগুলি এই অর্দ্ধশতাব্দী কালের মধ্যে বাঙালীর সাহিত্যে ও মনের উপর এমন একটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে ভবিষ্যতে কোন কবির সেই সকল কবিতারই অনুবাদ বা অনুসরণ উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেও তাহা সহজে আপনার স্থান করিয়া লইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। এতদ্ব্যতীত ইহা বলাও আবশ্যক যে পারসিক কবিদিগের নিকট ঋণী হইলেও তিনি তাঁহার সকল কবিতাতেই বেশ স্পষ্ট একটি নিজস্ব ছাপ দিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা সামান্য কথা নয়। কৃষ্ণচন্দ্রের অনেক কবিতা বাঙালীর গৃহে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে, ইহা হইতেই সেগুলির শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা একবার একটি জাতির চিত্তের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহাকে উন্মূলিত করা সাধারণ শক্তির আয়ত্তাধীন নহে। তাই বলিতেছিলাম কৃষ্ণচন্দ্র নিজের ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রহিয়াছেন; তাঁহার দোসর কেহ নাই, কারণ তিনি যে

পথে বিচরণ করিয়াছেন তাহা কণ্টকসমাবৃত বলিয়া অনেকেই সে পথ পরিহার করিয়া কুসুমাস্তৃত পথেই বিচরণ করিবার জন্য উৎসুক। জাতির চিত্তক্ষুধা দূর করিবার জন্য যাঁহারা এই উভয়বিধ পথের মধ্যে কণ্টকাকীর্ণ পথই নির্ব্বাচন ও অনুসরণ করিয়াছেন তাঁহারা ধন্য। তাঁহাদের সাধনা যেমনই হউক না কেন, আমদের অজ্ঞাত-সারে তাহা জাতীয় শক্তিভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া থাকিবে ও আমাদিগকে গৌরব ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করিবার পক্ষে প্রতিদিন সহায়তা করিবে।

অষ্টম অধ্যায়।

সদ্ভাবশতক ও অন্যান্য গ্রন্থের সমালোচনা।

কৃষ্ণচন্দ্র অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সদ্ভাবশতক, গ্রা,সের ইতিবৃত্ত, মোহভোগ ও কৈবল্যতত্ত্ব এই চারিখানি গ্রন্থের নাম ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

(৫) নলোদয়ের বঙ্গানুবাদ।

(৬) রাবণবধ নাটক।

(৭) সৎপ্রেক্ষণ (দৃশ্য কাব্য বিশেষ)।

(৮) সংস্কৃত গদ্য পদ্য স্থাপনা বিধি।

(৯) অনুবাদিত স্তোত্র।

(১০) সংস্কৃত ব্যাকরণ।

(১১) ভারতেশ্বরীর নিকট প্রার্থনীয়া রাজনীতি।

(১২) বিবিধ সঙ্গীত।

সদ্ভাবশতক ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য সকল গ্রন্থেই তিনি এত অধিক পরিমাণে অপ্রচলিত ও উদ্ভট শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যে সে গুলির অন্য সহস্র গুণ থাকিলেও ঐ একটি দোষেই সব গুলি অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রধানতঃ গদ্য রচনায় তাঁহার এই দোষ অধিক বর্ত্তমান। কৃষ্ণচন্দ্র জানিয়া শুনিয়া এইরূপ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার যুক্তি ছিল যে অভিধানে যত প্রকার শব্দ আছে সে সকলই ব্যবহৃত হওয়া

উচিত, নতুবা সে গুলির অস্তিত্বের সার্থকতা থাকে না। যাহাই হউক, এই এক প্রধান দোষে তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের অনধিগম্য ও অনাদরের সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার লিখিত "ভারতেশ্বরীর নিকট প্রার্থনীয়া রাজনীতি" নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। অতি সহজ ভাবে, অতি সুন্দররূপে তিনি তৎকালের রাজনীতির এমন সূক্ষ্ম সমালোচনা এই গ্রন্থে করিয়াছেন যে অনেক রাজনীতিব্যবসায়ীও তাহা পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইবেন। এই গ্রন্থ মজুমদার-কবির এক জামাতার গৃহে সযত্নে সংরক্ষিত আছে।

"বিবিধ সঙ্গীত" হইতে দুই একটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করা গেল। রামপ্রসাদ সেন, রসিক রায় প্রভৃতি সঙ্গীত রচয়িতাদিগের সঙ্গীতের তুলনায় কৃষ্ণচন্দ্রের এই সঙ্গীত গুলি কি রচনার দিক, কি ভাবের দিক, কোনো দিক হইতেই খুব উচ্চ অঙ্গের বলিয়া মনে হয় না। তথাপি পাঠককে বিচারের সুযোগ দেওয়া আবশ্যক বোধে দুইটি সঙ্গীত এখানে অবিকল উদ্ধৃত করা গেল।

প্রথম সঙ্গীত।

কালীতত্ত্ব চমৎকার !
যাঁর শ্যাম বরণে বিধুভাতি,
মনে করি অন্ধকার ॥
চিন্ময় ঈশ্বর তিনি,
দেহধারী কালিকার।
পতিভক্তা, পদে পতি, সদা তাঁর শবাকার ॥

শুম্ভ নিশুম্ভ বিনাশে,
কৈলা তিনি রণ স্বীকার।
কিন্তু ইচ্ছাবশে জানি তাঁর সদা ত্রিজগদ্বিকার

দ্বিতীয় সঙ্গীত

আশ্চর্য্য করুণা তব হে করুণা পারাবার
বঞ্চিত যাহাতে নয় এ অধমও অনিবার ॥
হলে আমি ধরাগত
হইয়াছে ক্রমে গত
বহু অহোরাত্র, গত
মাস পক্ষ তিথি বার ॥
একদিন অনশনে
যায় নাই অবসনে
দহিলেও হুতাশনে
পেয়েছি শান্তি আবার ॥

হস্তাক্ষর, রচনার ভাব প্রভৃতি হইতে আমরা স্থির করিয়াছি এই সঙ্গীতগুলি কবির যশোহর হইতে অবসর লইবার পর রচিত হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র ঢাকা ত্যাগ করিবার পর হইতেই প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মে তাঁহার আস্থা কতকটা ফিরিয়াছিল, প্রতিমাপূজার প্রতি তাঁহার অনুরাগও জন্মিয়াছিল। যশোহর বাসকালে বৌদ্ধ মতের পক্ষপাতী হইলেও তিনি হিন্দু সমাজকে অতিক্রম করেন নাই। এ সময়ে তিনি ব্রাহ্ম মতের অত্যন্ত বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার "কৈবল্যতত্ত্ব" নামক গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় :—"এই পুস্তকে কৈবল্য ও কৈবল্য লাভের উপায় বিষয়ে

যে মত প্রকাশ করিয়াছি, তাহা কেবল ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ; এ নিমিত্তে মহানুভব ব্রাহ্মগণ খিন্ন না হইয়া স্বমতপক্ষপাতিতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহার অনুবর্ত্তন করিলে তাঁহাদের উপযুক্ত মহানুভবতা প্রকাশ করা হইবে। তাঁহাদের অঙ্গীকার এই যে, পৃথিবীর কোন ধর্ম্মবিশেষ তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। কিন্তু যে ধর্ম্ম সত্য, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম, এই অঙ্গীকারানুসারে তাঁহাদের মৎপ্রদর্শিত ধর্ম্মকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কারণ তাঁহারা যদি নিরপেক্ষ হইয়া অভিনিবিষ্ট চিত্তে এই পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখেন, তবে অবশ্যই তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে যে এতৎ প্রদর্শিত ধর্ম্ম সত্য ধর্ম্ম। তাঁহারা যদি কুসংস্কার পরবশ হইয়া ইহাতে উপেক্ষা করেন তবে নিরতিশয় পরিতাপের বিষয়। যাঁহারা এতকাল সর্ব্বান্তঃকরণে কুসংস্কারের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারা এখন কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইবেন। তাহা হইলে এরূপ বিবেচনাও অসঙ্গত নহে যে, কতিপয় বৎসরান্তে এই তিগ্মতম মার্ত্তণ্ড শীতাংশুবৎ হইবে। হে ব্রাহ্মগণ! একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন যে বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা আপনাদের অভিমত যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না, অন্ধের ন্যায় অনর্থক তাঁহার উপাসনা করা কি ভবাদৃশ বুদ্ধিমজ্জীবগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম? আপনারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব পক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা নিতান্ত অলীক। আপনারা বলেন, যদি গভীর অরণ্যে হঠাৎ একটি অট্টালিকা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে যেমন তাহা হইতে তাহার নির্ম্মাতার অনুমান হয়, সেইরূপ এই জগৎ দেখিয়াও ইহার নির্ম্মাতার অনুমান হয়। ইহা কখন বিশুদ্ধ যুক্তি নহে। কারণ, জগতের ভাব ও অট্টালিকার ভাব পরস্পর অচিন্তনীয় ভিন্ন। ভিন্ন পদার্থের দ্বারা ভিন্ন পদার্থের সত্যতা স্থাপন কখন গ্রাহ্য নহে ;

জগতের অনেক রচনা কৌশল দ্বারা কর্ত্তার উপলব্ধি হয় সত্য, কিন্তু সে কর্ত্তৃস্থলে আপনাদের অভিপ্রেত আরাধ্য জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বর গ্রহণীয় হইতে পারেন না। এ বিষয়ের যুক্তি কৈবল্য-তত্ত্বে প্রকটিত হইয়াছে।" ইহা হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার তদানীন্তন মনোভাব পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য কৈবল্য তত্ত্ব কৃষ্ণচন্দ্রের যশোহর অবস্থানকালে লিখিত হইয়াছিল। ১২৮৯ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ আটাশ বৎসর পূর্ব্বে কুমারখালীর মথুরানাথ যন্ত্রে উহা মুদ্রিত হয়। যশোহর হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তিনি সর্ব্বৈব হিন্দুধর্ম্মের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্ধৃত সঙ্গীত সেই কথারই সাক্ষ্য দিতেছে। কৈবল্য তত্ত্বের যে অংশ উদ্ধৃত করা গিয়াছে তাহাতে কৃষ্ণচন্দ্রের যে মত অভিব্যক্ত হইয়াছে সে সম্বন্ধে তাঁহার বর্ত্তমান জীবনচরিত লেখকের স্বতন্ত্র মত থাকিলেও তাহা এখানে প্রকাশ করিবার কোন সার্থকতা নাই, কারণ কৃষ্ণচন্দ্রের মত বর্ণনই এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য, মতখণ্ডন সে উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

কৃষ্ণচন্দ্রের আত্মচরিত রা, সের ইতিবৃত্ত নামক গ্রন্থের ভাষাও স্থানে স্থানে শ্রুতিকটু ও দুরূহ। অপেক্ষাকৃত সুখপাঠ্য অংশ পাঠকদিগের পরীক্ষার্থ এখানে উপস্থিত করা গেল। ঐ গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠায় কৃষ্ণচন্দ্র লিখিতেছেন,—"সায়ংকালে তাঁহারা একটি পদ্মবনে উপস্থিত হইলেন। পদ্মবনের শোভা শান্ত সুখজনক। ভাস্করাভিমুখি প্রস্ফুটিত রক্ত কমল সকলের উজ্জ্বল রাগ। তাহার মৃণালভঙ্গি সুদৃশ্য। মধ্যে মধ্যে সুজাত কোরক থাকে। কোমল সবুজবর্ণ পত্রনিচয়ে জল আবৃত থাকে। তাহার কোন কোন পত্রের উপরে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নির্ম্মল ও তরল পয়ঃপয়ল সকল নয়ন আকর্ষণ করে। ইতস্ততঃ নানা বর্ণের পতঙ্গ সকল উড়িয়া বেড়ায়। কিন্তু তাহাতে রা, সের চিত্তজাত

ঔৎসুক্যের উদয় হইল না।" ঐ গ্রন্থের অন্যত্র (১৮শ পৃঃ) কৃষ্ণচন্দ্র লিখিতেছেন,—"একদিন কেহ তাঁহাকে কলম ক্রয় করিতে কয়েকটি পয়সা দিলেন। রা, স একটি পণ্যাগারে উপস্থিত হইয়া একটি সংহতি ধরিয়া যেমন টান দিলেন, অমনি তাহার আঘাত লাগিয়া তাক হইতে কয়েকটি কাচপাত্র পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। বিক্রেতা তাহার মূল্য চাহিলেন। রা, স পয়সা কয়েকটি গোপনে রাখিয়া রোদিত-প্রায় হইয়া তাঁহার দয়ার পাত্র হইতে যত্ন করিলেন। অনন্তর ভিক্ষার্থী হইয়া রাজপথের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু কাহার নিকটে যাচ্ঞা করিতে সাহস প্রাপ্ত হইলেন না। ফিরিয়া আসিয়া বিক্রেতাকে পিতা ডাকিয়া কহিলেন, তুমি অনুমতি কর, আমি বাসা হইতে ইহার মূল্য আনিয়া দিব; বোধ হয় বিক্রেতা তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া মহাপুরুষবৎ সদয় হইয়াছিলেন, অনুমতি করিলেন। একটী বালককে তাঁহার সঙ্গে যাইতে কহিলেন। রা, স শঙ্কিত হইলেন ও একটী প্রতারণায় তাঁহাকে তাহাতে নির্ব্বৃত্ত করিয়া গেলেন। মূল্য লইয়া আর আসিলেন না। বোধ হয় আশ্রয়দাতার নিকটে মূল্যার্থ যাচ্ঞা করিলে তাহা নিষ্ফল হইত না। কিন্তু তাঁহার ভৎর্সনার আশঙ্কায় গুরুতর হৃদয়ভার বহন করিতে লাগিলেন। পরে এক সময়ে রা, সের এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে তিনি অনায়াসে ঐ মহা ঋণদায় হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু লজ্জায় তাহা হইলেন না। পাপ বিমোচনের অবিধেয় লজ্জায় রাজপথের হৃদয় নিষ্পেষণী উদ্বেজকতা সহ্য করিতেন।"

শেষোদ্ধৃত অংশ হইতে পাঠক কৃষ্ণচন্দ্রের গদ্য রচনার আভাস পাইবেন। ঐ অংশ উদ্ধৃত করিবার আরও একটু উদ্দেশ্য আছে। গ্রন্থকার বাল্যকালের পাপও স্মরণ করিয়া এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া-

ছেন ; বিখ্যাত লেখক রুষোর (Confessions of Rosseau) আত্মচরিত গ্রন্থের সহিত কেহ কেহ "রা, সর ইতিবৃত্তের" তুলনা করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র যেরূপ নিঃসঙ্কোচে স্বীয় জীবনের কায়িক, বাচনিক ও সূক্ষ্মতম মানসিক পাপ স্বীকার করিয়াছেন তাহাতে "রা, সের ইতিবৃত্তের" সহিত রুষোর ইতিবৃত্তের তুলনা অসঙ্গত হয় নাই। তাঁহার আত্মচরিতের ৩৯ পৃষ্ঠা পাঠ করিতে আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে বক্তব্য এই যে, যিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে আত্মগ্লানির সহিত এই সকল পাপ স্বীকার করিতে পারেন তিনি তাঁহার সকল দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। অধিকন্তু তাঁহার সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে তাঁহার জীবনের প্রধান যে কয়েকটি পাপ তাহা তাঁহার উন্মাদ অবস্থাতেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আরও একটি কথা এই যে, এই আত্মচরিতও তাঁহার উন্মাদ অবস্থার রচনা ; সুতরাং ইহার সকল ঘটনা যে তিনি যথাযথ ভাবে ব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন এরূপ মনে হয় না। উন্মাদ রোগের প্রভাব হেতুই তিনি অনেক স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিন্তাকে স্থায়ী মানসিক পাপ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন ও সেগুলিকে আত্মচরিতে স্থান দিয়াছেন।

যে কাব্য রচনা করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে আসন লাভ করিয়াছেন সেই কাব্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। সম্ভাবশতকের প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ আর পাওয়া যায় না। অনেক চেষ্টার পর পঞ্চম সংস্করণের একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। আলোচনা কালে আমরা উহা হইতে পাঠ উদ্ধার করিব।

সম্ভাবশতকের প্রথম কবিতার নাম "দুরাশা"। কালিদাস রঘুবংশের প্রথম সর্গের প্রারম্ভভাগেই লিখিয়াছেন,—"মন্দঃ কবি যশঃ-প্রার্থী গমিষ্যাম্ উপহাস্যতাম্। প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ

উদ্বাহুরিব বামনঃ॥” কৃষ্ণচন্দ্রের “দুরাশা” শীর্ষক কবিতাটির বক্তব্য কতকটা তাহাই, কিন্তু উহা পারসিক কবিদিগের রসে সিক্ত। উদ্বোধন, মোহ, প্রভাতকালে মনুষ্যের প্রতি উপদেশ, কাল—শমন, মনের প্রতি উপদেশ, অনিত্যতা, প্রেম, ঈশ্বর প্রেম, প্রকৃত বন্ধু ঈশ্বর, ঈশ্বর বিরহে বিলাপ. প্রণয়, প্রণয়—কানন, বৃথা কাল ক্ষেপণ জন্য খেদ, মনের প্রতি, দুঃখবিনা সুখ হয় না, মত্ততা প্রভৃতি কবিতায় কৃষ্ণচন্দ্র হাফিজের ভাবের ভাবুক হইয়াছেন। রহস্য, সাধু ও নীচ, মানাপমান প্রভবানুসারী নয়, অপব্যয়ের ফল, কুসঙ্গ, বাগ্মিতা ও রসনাশাসন, চিন্তা করিয়া কথা বলা উচিত, ভিক্ষা, উপদেশকের কদাচার দেখিও না—তাঁহার উপদেশ শ্রবণ কর, আত্মশ্লাঘা, বাগাড়ম্বর, বাহ্য বেশ, নিন্দক, আত্মক্ষমতা-চিন্তা, সুখী দুঃখীর দুঃখ বুঝে না প্রভৃতি কবিতায় কৃষ্ণচন্দ্র সাদীর অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। তাঁহার মৌলিক কবিতার মধ্যে সুচারু বিশ্ব, বৃক্ষ, পাপ-কেতকী, বর্ষাকালে ঈশ্বর-বিরহীর বিলাপ, ধার্ম্মিকের মৃত্যুর প্রতি উক্তি, নিদাঘ নিশীথ ভ্রমণ ও বিবিধ চিন্তা, উষা, নিদ্রা, বৈকালিক ঝড় প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যের দুঃখ দেখিলে তোমার দুঃখ দূর হইবে, বহুদিন পরে প্রবাসীর জন্মভূমি দর্শন ও আর দুই একটি কবিতাকে একাধারে মৌলিক ও অন্য রচনার ছায়াপ্রাপ্ত কবিতা বলা যাইতে পারে। সাদীর একটি রচনায় পদবিহীন লোককে দেখিয়া জনৈক পাদুকাবিহীন লোকের পাদুকার জন্য আক্ষেপ দূর হইয়াছিল এরূপ লিখিত আছে; কিন্তু শুনা গিয়াছে একদিন ছিন্ন জুতা পরিয়া জুতার অভাব চিন্তা করিতে করিতে উপাসনার নিমিত্ত ঢাকা ব্রাহ্ম-সমাজে গিয়া তাঁহার জুতার ক্ষোভ মিটিয়াছিল তাহা হইতেই উক্ত কবিতার উৎপত্তি। ইহা মনে করিবার আরও

কারণ আছে ; উক্ত কবিতার শেষভাগে আর একটি দৃষ্টান্ত আছে সে দৃষ্টান্তটি সাদীর রচনায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সে দৃষ্টান্তটি এই :—"গভীর রাত্রিতে অন্ধকার বনে একজন পথিক পথ হারাইয়া বিলাপ ও রোদন করিতেছিল এমন সময় একজন লোক তাহাকে জলদগম্ভীর স্বরে ডাকিয়া বলিল হে পথিক! তুমি বনের মধ্যে পথ হারাইয়া কাঁদিতেছ, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছ, তবে তুমি আসিয়া আমার অবস্থা দেখিয়া যাও। আমি এই কূপের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি। আমার গলা অবধি জলে নিমগ্ন, আমার উঠিবার উপায় নাই, দুটি চাক দুই হাতে ধরিয়া কোনমতে বাঁচিয়া আছি।" এই কথা শুনিয়া পথহারা পথিক শান্ত হইল, অপরের অবস্থা নিজের অবস্থা অপেক্ষা হীন দেখিলে স্বতঃই মানুষের মনে সান্ত্বনা আসে। "প্রবাসীর জন্মভূমি দর্শন" শীর্ষক কবিতার স্থানে স্থানে পারসিক কবিদিগের রচনার রেশ আছে কিন্তু তথাপি উহাকে মৌলিক কবিতা বলিতে হইবে। ঢাকা হইতে বহুদিন পরে সেনহাটিতে আসিয়া উক্ত কবিতা রচিত হইয়াছিল। অন্য কবিতার রেশ থাকিলেও ইহাতে কৃষ্ণচন্দ্রের নিজস্ব ভাব এত অধিক পরিমাণে বিদ্যমান যে উহাকে মৌলিক কবিতার শ্রেণীতে স্থান দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ হয় না।

সুচারু বিশ্ব, নিদাঘনিশীথ ভ্রমণ, উষা, নিদ্রা প্রভৃতি কবিতা বাঙলা দেশের কাব্য সাহিত্যের অলঙ্কার স্বরূপ। "নিদাঘনিশীথ ভ্রমণ" শীর্ষক কবিতাটি কাহারো মতে ঢাকায় বুড়ী গঙ্গার ধারে কামিনী ফুল গাছের তলায় বসিয়া রচিত, কেহ বলেন উহা সেনহাটিতে ভৈরবনদের তীরে দুইটি কামিনী ফুলগাছের মধ্যে বসিয়া রচিত। শেষোক্ত কামিনী ফুল গাছ দুইটির মধ্যে একটি ঝড়ে ভাঙিয়া গিয়াছে, একটি এখনও অবশিষ্ট আছে; লোকে এই গাছটি দেখাইয়া বলে ইহাই কৃষ্ণচন্দ্রের বিখ্যাত

"কামিনী-কুসুম-তরু।" লোকে যাহাই বলুক না কেন, এই কবিতাটি একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহার অঙ্কিত চিত্র সেনহাটি ব্যতীত অন্য কোনো স্থানের হইতে পারে না। কবি বৃক্ষলতার যে নিবিড়তার উল্লেখ করিয়াছেন,এবং যে সকল বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের একত্র সমাবেশ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ঢাকার কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি যে নারিকেল বৃক্ষের বাহুল্য বর্ণনা করিয়াছেন সেই নারিকেল বৃক্ষের ঢাকায় বিশেষ অপ্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এদিকে তাঁহার জন্মভূমিতে তাঁহার বর্ণিত সকল গাছই যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই কবিতাটিতে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রকৃতি-দুলাল শিশু-মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ঐ কবিতাটির মত কবিতা প্রাচীন কাল হইতে নিতান্ত আধুনিক কালের কোনো কবির কাব্যগ্রন্থে পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতির সহিত তাঁহার সহানুভূতি এত গভীরভাবে আর কোনও কবিতায় অনুভব করি নাই। এমন একটি দেশী ভাব কবিতাটির মধ্যে পরিস্ফুট,এমন একটি অবসাদ-বিহীন মদিরভাব সমস্ত কবিতাটিকে ভরপূর করিয়া রাখিয়াছে যে পাঠক মুগ্ধ না হইয়াই পারেন না। কবি লিখিয়াছেন—

"বিকশিত কামিনী-কুসুম-তরুতলে
বসিলাম চিন্তাসখী সহ কুতূহলে।"

কবির একজন ভক্ত বহু আয়াস স্বীকার করিয়া কবিকে সেই কামিনী তরুতলে বসাইয়া তাঁহার প্রতিকৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই প্রতিকৃতি এখানে প্রদত্ত হইল। আশা করি পাঠক অন্ধ, অনাড়ম্বর কবির চিত্র দেখিয়া সুখী হইবেন। প্রাসাদে যিনি লালিত পালিত হন নাই, বসোরা, সার ওয়াল্টার স্কট, মার্শাল নীল, ভিক্টোরিয়া রোজ, এমন কি সামান্যতম ডেজি পুষ্প যাঁহার কুটির পার্শ্বে কোনদিন হাসে



স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

নাই, আইভি লতা যাঁহার কুঞ্জকুটিরদ্বারে লতাইয়া উঠে নাই, তাঁহার চিত্র দেখিবার কৌতূহল স্বাভাবিক না হইতে পারে, কিন্তু যিনি চক্ষুষ্মান্ তিনি এই ছবির মধ্যেই প্রকৃত কবিকে দেখিতে পাইবেন, স্বতন্ত্র করিয়া তাঁহার আর পরিচয় দিবার আবশ্যক হইবে না।

"উষা" তাঁহার বিখ্যাত কবিতা। ইহা সঙ্গীতরূপে এক সময়ে কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হইত। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রায়ের "কতকাল পরে" ও "নির্ম্মল সলিলে" এই দুইটি গান যেমন বাঙ্‌লা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়াছে কৃষ্ণচন্দ্রের এই সঙ্গীতটি সেইরূপ অমর হইয়া থাকিবে। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সঙ্গীত-রচয়িতাদিগের অক্লান্ত সাধনবলে ব্রহ্ম-সঙ্গীতের অভাব ঘুচিয়াছে কিন্তু এক সময় ছিল যখন ভগবৎসম্বন্ধীয় সঙ্গীতের একান্ত অভাব অনুভূত হইত। শুনা যায় এই শ্রেণীর সঙ্গীতের অভাবে সেকালে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সান্ধ্য উপাসনাতেও কখনো কখনো কৃষ্ণচন্দ্র রচিত "অয়ি সুখময়ি উষে" সঙ্গীতটি গীত হইত। এই হাস্যকর ব্যাপার হইতে তৎকালে ব্রহ্মসঙ্গীতের কিরূপ অভাব ছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ৺ব্রজসুন্দর মিত্রের বাড়ীতে সেকালে "ব্রাহ্ম স্কুল" নামক একটি বিদ্যালয় ছিল। শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায়, সার অঘোরনাথ, কবি কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। সেই বিদ্যালয়েও এই সঙ্গীতটি সময়ে সময়ে গীত হইত। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। এই কবিতাটি সম্বন্ধে অধিক বলিবার আবশ্যক হইবে না, শুধু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে প্রকৃতি-প্রেমিক ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতিসম্বন্ধীয় যে কোনো শ্রেষ্ঠ কবিতার সহিত ইহা আসন পাইবার যোগ্য। যে সময়ে ইহা রচিত হইয়াছিল ইহা সে সময়ের প্রকৃতিসম্বন্ধীয় শ্রেষ্ঠ-কবিতা; বিহারিলাল ইহার আরো পরে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। কবি

অনুভব করিয়াছেন উষা তাহার কমলনয়ন খুলিয়া কোন্ অজ্ঞাতের দর্শন আশায় চাহিয়া আছে এবং সেই অজ্ঞাতের উদ্দেশেই তাহার প্রেম-অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। ইহা হইতেই প্রকৃতির সহিত তাঁহার যে একটা নিগূঢ় অনুভূতির যোগ ছিল তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তত্ত্বজ্ঞ ইহাকে বিভূতি-যোগ বলিবেন; কৃষ্ণচন্দ্র এই যোগসূত্রে অনেক সময়ে তাঁহার উপাস্য দেবতার সহিত যুক্ত হইতেন।

"নিদ্রা" কবিতাটিও অতি সুন্দর। ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের "নিদ্রা" (Sleep) সুন্দর কবিতা; কৃষ্ণচন্দ্রের কবিতাটি সুন্দরতর। ইহার মধ্যে এমন একটি নিখিলব্যাপিনী সহানুভূতির ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে যে পাঠ করিতে করিতে কবিকে অজস্র সাধুবাদ প্রদান করিতে ইচ্ছা হয়। যে সার্ব্বভৌমিক ভাবকে (urbanity) ম্যাথু আর্নল্ড উচ্চশ্রেণীর রচনার প্রাণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন সেই সার্ব্বভৌমিকতা এই কবিতাটিকে ওতঃপ্রোতভাবে বেষ্টন করিয়া আছে। সকল বিষয়েরই সঙ্কীর্ণতার দিক পরিহার করিয়া চলিবার তাঁহার একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল।

"বৈকালিক ঝড়ে" তাঁহার উল্লিখিত গুণগুলি বিশেষরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাঠক বর্ণনাভঙ্গী দেখুন—

"প্রগাঢ় সবুজ নীল বরণে ভূষিয়া,
রাশি রাশি তুলা যেন বেড়ায় উড়িয়া।
কতগুলা দক্ষিণে যাইছে বেগভরে,
ঊর্দ্ধে তার কতগুলা ধাইছে উত্তরে।
কিছুদূর যেয়ে পুন অন্য দিকে যায়,
ভেদিয়া নামার মেঘ নীচুপানে ধায়।
নীলাম্বরী-পরা গায় সবুজ মঞ্জল,
নাচেরে প্রকৃতি যেন উড়ায়ে অঞ্চল।"

অন্যত্র—

"শকুন শকুনী চিল এই ত গগনে
পুলকে উড়িতেছিল মণ্ডলগমনে ;
দেখিয়া জলদ ঘটা বিপদ ভাবিয়া,
দ্রুতগতি ধরাতলে আসিছে ধাইয়া।
দুপাশের ডানা দুটি উচু করি কেহ
সোজাসুজি ছাড়িয়া দিয়াছে দেখ দেহ।
কেহ বা বাঁকায়ে ডানা বাঁকা পথ ধরি,
ছুটেছে নক্ষত্র বেগে উপহাস করি।"

পাঠক দেখিবেন কবির বর্ণনাভঙ্গী যেমন সহজ, পর্য্যবেক্ষণী শক্তি তেমনি অসাধারণ।

কৃষ্ণচন্দ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চটুল কবিতাগুলির ক্ষমতা অপরিসীম। এই কবিতাগুলি প্রধানতঃ সাদীকে অনুসরণ করিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্‌লা দেশের অস্থিমজ্জার মধ্যে সেগুলি প্রবেশ লাভ করিয়াছে। যে জন দিবসে মনের হরষে, কমল তুলিতে যদি করহ বাসনা প্রভৃতি কবিতা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের মুখেই উচ্চারিত হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের "ক্ষণিকা" গ্রন্থখানি এই শ্রেণীর কবিতায় পূর্ণ। বিহারিলালের একটি কবিতাংশ এইরূপ প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে :—

"যেখানে দেখিবে ছাই
উড়াইয়ে দেখ তাই
মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন"।

কৃষ্ণচন্দ্রের বহু কবিতা এইরূপে লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে ঘুরিয়া বেড়াই-

তেছে। যে কবি স্বদেশবাসীর মনের উপর এতটা অধিকার বিস্তার করিতে পারিয়াছেন তাঁহার কি সৌভাগ্য! তিনি দেহাতীত হইলেও জীবিত—তাঁহার পুত্র পৌত্রই শুধু তাঁহার তর্পণ করে এমন নয়—দেশবাসী প্রতিদিনই অজ্ঞাতসারে তাঁহার তর্পণ করিয়া থাকে। যে দেশে এইরূপ কবি জন্মগ্রহণ করেন সে দেশ ধন্য; যে দেশের অধিবাসিগণ এরূপ কবির স্বজাতীয়, স্বদেশীয় বলিয়া গৌরব করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন তাঁহারাও ধন্য।

কৃষ্ণচন্দ্রের রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিয়া এ অধ্যায় শেষ করিব। কবির পরিচয় কাব্যে; কৃষ্ণচন্দ্রের সে পরিচয় দিতে পারিয়াছি কি না জানি না; তিনি আমাদের দেশের কাব্য-সাহিত্যের একটি দিক অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনো বলিতেছি তাঁহার প্রদর্শিত পথে তাঁহার উপযুক্ত দোসর বা প্রতিদ্বন্দ্বী এখনো কেহ অভ্যুদিত হন নাই, শীঘ্র হইবেন এরূপ সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। কৃষ্ণচন্দ্রের রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা কঠিন, কারণ ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের জন্য তিনি অনেকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। যে কয়টি নিশ্চিত তাঁহার রচনা বলিয়া জানা গিয়াছে তাহার সংখ্যা অধিক নহে। নূতন ভাবের বহু সঙ্গীত অন্যান্য লোকে রচনা করায় কৃষ্ণচন্দ্রের কোন কোন সঙ্গীত সঙ্গীত-গ্রন্থ হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। কথাই আছে, "The old order changeth giving place to new." সে পুরাতন দিন আর নাই, সে পুরাতন ব্যবস্থাও লোপ পাইয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্রের অদ্যাপি প্রাপ্য ব্রহ্মসঙ্গীতগুলির তালিকা দেওয়া গেল:—

(১) অয়ি সুখময়ি উষে!

(২) পিতঃ ক্ষম অপরাধ!

(৩) শান্তি কোথা আছে আর ? *
(৪) প্রবল সংসার-স্রোত
(৫) সীমা কে জানে ? জননী !
(৬) তুমি আত্মীয় হইতে পরমাত্মীয় হে
(৭) কেন তারে ভুল, সে কি ভুলিবার ধন ?
(৮) কে করিল দিবাকর !
(৯) কি বেশ ধরেছ আজি

ইহার মধ্যে তিন চারিটি আধুনিক ব্রহ্মসঙ্গীত গ্রন্থে ও অন্যান্য গুলি অন্যান্য সঙ্গীত গ্রন্থে এখনো দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে ষষ্ঠ সঙ্গীতটি অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু শ্রোতা এবং গায়ক হয়তো কেহই জানেন না যে তাহা কবি কৃষ্ণচন্দ্রের রচনা। উক্ত সঙ্গীতটি সকলের স্মরণ না থাকিতে পারে সেই জন্য উহা এখানে উদ্ধৃত হইল—

* এই সঙ্গীতটি পুরাতন সদ্ভাবশতক গ্রন্থের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর প্রণীত মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের জীবনচরিত গ্রন্থের ৪১৯ পৃষ্ঠায় জীবনীকার এই সঙ্গীতটি গোস্বামী মহাশয়ের রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহা ভ্রমবশতঃ ঘটিয়াছে। পুরাতন সদ্ভাবশতক গ্রন্থ বঙ্কবাবু দেখেন নাই অধিকন্তু নববিধান সমাজভুক্ত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন মহাশয়ের সঙ্কলিত বিবিধ সঙ্গীতগ্রন্থও তিনি দেখেন নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ঢাকা উয়ারীনিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়দিগের নিকট অনুসন্ধান করিলে বঙ্কবাবু এ বিষয়ের যাথার্থ্য অবগত হইতে পারিবেন।

খাম্বাজ জংলা—ঠুংরি।

(লক্ষ্ণৌ ঠুংরি)

তুমি আত্মীয় হ'তে পরমাত্মীয় হে,
আছে তোমা হতে কে সংসারে?
পিতা মাতা জায়া, তনয় তনয়া,
আর এত দয়া কে করিতে পারে?
করুণার নিধান বিভু তুমি হে,
কত না করুণা করিলে পাপীরে।
সুখ-সাধন এই শরীর মন,
করুণার নিদর্শন নাথ! তব।
গ্রহ-তারক-মণ্ডিত নীল নভঃ,
ধন-ধান্য-ভরা রমণীয় ধরা;
সুগভীর তরঙ্গিত নীর-নিধি,
হিম-রঞ্জিত শোভন তুঙ্গ-গিরি;
সকলে পুলকে সমতান ধরি,
করিছে করুণা তব কীর্ত্তন হে।

এই সুন্দর সঙ্গীতটি যে কৃষ্ণচন্দ্রের রচিত তাহা আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে জানিতাম না। তাঁহার অন্যান্য সঙ্গীতও হয়ত এইরূপ আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদেরই কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া থাকে। এই সঙ্গীত-গুলির অধিকাংশের দ্বারাই কবির ঈশ্বরকে বিভূতি-যোগে দর্শন করিবার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়।

যে প্রদীপ প্রদীপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায় তাহার সেই ক্ষণস্থায়ী উজ্জ্বল দীপ্তির সহিত, দুঃসহ তেজে বিমানপথে ধাবমান

খধূপের দীপ্তির সহিত, অথবা দুর্জ্জেয় বেগে পৃথিবীর অভিমুখে সঞ্চরণ-শীল জ্বলন্ত উল্কাখণ্ডের সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের কবি-প্রতিভার তুলনা করা যাইতে পারে। অতি অল্প সময়ের জন্য তাঁহার প্রতিভার স্ফূরণ ও অতি অল্প সময়ের মধ্যে সে প্রতিভার অভিব্যক্তি সমাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার সে দীপ্তি ক্ষণস্থায়ী হউক ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহা যে অসামান্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার সে দীপ্তি প্রখর বটে কিন্তু তাহার উত্তাপ মানুষের চিত্ত-গহনে দাবানলের সৃষ্টি না করিয়া তাহাকে সংশয়বহুল অন্ধকারময় সংসার-পথে আশার আলোক দেখাইয়া তাহার পথ সুগম করিয়া দেয়। তাঁহার কবিতা মানবপ্রকৃতির মধ্যে যে পশু ভাব আছে তাহাকে না জাগাইয়া তাহার মধ্যে যে দেবভাব আছে তাহাকেই জাগরিত করিয়া তুলে। এমন কবির কাব্য আমাদের শ্রদ্ধার সামগ্রী, এমন কবির জীবন আমাদের অনুশীলনের বিষয়। এমন কবি যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সে দেশ ধন্য, যে দেশে এমন কবি সম্মানিত হইয়াছেন সে দেশ ধন্যতর। কৃষ্ণচন্দ্রের কাব্য ও জীবন তাঁহাকে অমর করিবে, সে জন্য কাহাকেও চেষ্টা করিতে হইবে না। তাঁহার জীবন চরিত তাঁহার জন্য নহে—আমাদের জন্য। তিনি শুধু বাঙালীর ও বাঙলা দেশের নহেন—তাঁহার মত মহাত্মার জীবন জগতের আদরের সামগ্রী। তাঁহার নিজের গুণে তিনি মানবজাতির চিরন্তন সুহৃদরূপে গণ্য হইবার উপযুক্ত।

নবম অধ্যায়

শেষ জীবন ।

ইংরাজী ১৮৯৩ অব্দের জুন মাসে কৃষ্ণচন্দ্র যশোহর জেলা স্কুলের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সামান্য কয়েকটি মুদ্রা তাঁহার বৃত্তিরূপে প্রাপ্য হইয়াছিল। তাঁহার বৃহৎ পরিবারের ব্যয় নির্ব্বাহের পক্ষে বৃত্তির অর্থ অতি সামান্য হইয়াছিল। গৃহে আসিয়া তিনি পূর্ব্বের পদ্ধতি অনুসারে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া ভৈরবের জলে হস্ত মুখ প্রক্ষালন, তার পরে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত অধ্যয়ন, তাহার পর স্নানাহার ও পুনরায় সায়ংকাল পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত অধ্যয়ন ও চিন্তা। অবসর গ্রহণ কালেই তাঁহার দৃষ্টিশক্তি কিছু ক্ষীণ হইয়াছিল, বৃদ্ধ বয়সে এইরূপ অধ্যয়নশীলতার ফলে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি দ্রুত হ্রাস প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্রে বাহ্যতঃ আবেগ ও উচ্ছ্বাসের কোনো স্থান ছিল না বলিয়াই মনে হয়। যৌবনে বিবাহের পর কিছুদিন নবপরিণীতা ভার্য্যার প্রতি ব্যবহারে তাঁহার কিছু উচ্ছ্বাস ও আবেগ দেখা গিয়াছিল। এই ভাবও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। তথাপি প্রেমের দিকের একটা ছবি আমরা তাঁহার জীবনে দেখিতে পাইয়াছি; অপত্যস্নেহের উচ্ছ্বাস তাঁহার চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় নাই বলিলেও হয়। কিন্তু উচ্ছ্বাস ও আবেগ তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে যথেষ্ট ছিল। ফল্গু নদীর মত সে উচ্ছ্বাস অন্তঃপ্রবাহিত ছিল। জনৈক

বিপত্নীক পাত্রের সহিত তাঁহার এক কন্যার বিবাহ হয়। উক্ত পাত্রের সন্তান ছিল। বিবাহ দিবসে কৃষ্ণচন্দ্র উক্ত পাত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রটীকে (বলা বাহুল্য এই বালকের বয়স অধিক হয় নাই) স্বীয় কন্যার ক্রোড়ে বসাইয়া দিয়া কৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "মা এই তোমার ছেলে, তোমার যেন আর ছেলে না হয়!" এই ঘটনাটির মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের হৃদয়াবেগের বেশ সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র যখন ছাত্র ছিলেন তখন কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে সেনহাটি হইতে যে সকল পত্রাদি লিখিতেন তাহা নিতান্ত নীরস ও বাধা গৎএর মত হইত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত মহাশয় বলেন সপ্তাহের পর সপ্তাহ উমেশবাবু পিতার নিকট হইতে একই শব্দবিন্যাস-বিশিষ্ট পোষ্ট কার্ড পাইতেন। সে গুলির মধ্যে কোনরূপ বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যাইত না। এই পত্র গুলি প্রায়ই তিন চারি পংক্তিতে সমাপ্ত হইত। সংসারে বিশেষ কিছু নূতন ঘটনা না ঘটিলে সাধারণতঃ পত্র গুলির বাধা-গৎ বদলাইত না। উমেশচন্দ্রের নিকট লিখিত, ঈষৎ বৈচিত্র্যবিশিষ্ট একখানি পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে; উহার অবিকল প্রতিলিপি এখানে প্রদত্ত হইল।

পরম কল্যাণবর প্রাণাধিক

শ্রীমান্ উমেশচন্দ্র মজুমদার

পরমকল্যাণবরেষু।

যশোর—শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর হোটেল।

শ্রীদুর্গা।

পরম কল্যাণবর প্রাণাধিকেষু।

তোমার পত্র পাইলাম। মুখের পীড়া অনেক কমিয়াছে এবং

ক্রমেই কমিতেছে। আর কোন উদ্বেগ নাই। কোন চিন্তা করিবা না। নিজ মঙ্গল লিখিবা। আমরা ভাল আছি।
ইতি ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৩।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

তাঁহার বাৎসল্যভাব অত্যন্ত গভীর ছিল সেই জন্য সকল সময়ে ধরা পড়িত না। একবার তাঁহার এক জামাতা দুরন্ত পীড়ায় ক্লেশ পাইতেছিলেন ; কৃষ্ণচন্দ্র নিজেও সে সময়ে পীড়িত ছিলেন। তাঁহার নিকট ঔষধ আনীত হইলে কৃষ্ণচন্দ্র ঔষধ গ্রহণে অসম্মত হইলেন। সকলে তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র অবশেষে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "সে যন্ত্রণায় অধীর হইতেছে আর আমি ঔষধ দ্বারা রোগযন্ত্রণা-মুক্ত হইব, ইহা কোনমতেই পারিব না।" জামাতার প্রতি এমন সুগভীর স্নেহের দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম লইয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার কর্ম্মের অন্ত ছিল না। প্রতিদিন প্রাতঃকালে দলে দলে গ্রামের ছেলে তাঁহার কাছে পড়িতে আসিত। সেনহাটির শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে কিছুদিন তাঁহার নিকট সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত স্থির হইয়াছিল তিনি তাঁহাদের প্রত্যহ দুই পৃষ্ঠা পড়াইবেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহারা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকটে গেলে তিনি তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, কোনো কথা না বলিয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে পড়াইতে আরম্ভ করিতেন এবং যেই দুই পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ হইত অমনি বিনা বাক্য-ব্যয়ে পুস্তক বন্ধ করিয়া আপনার কাজে মনোনিবেশ করিতেন।

কালীপ্রসন্ন বাবু বলেন তিনি এমন যন্ত্রের মত পড়াইয়া যাইতেন যে তাহা দেখিয়া ইন্দুবাবুর ও তাঁহার সময়ে সময়ে হাসি চাপিয়া রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিত। তাঁহারা কোনমতে কবির সম্মুখ হইতে উঠিতে পারিলেই বাহিরে আসিয়া নিরুদ্ধ হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিতেন। কৃষ্ণচন্দ্র একেবারে অন্ধ হইলেও এই পাঠনা কার্য্য হইতে কোনদিন অবসর পান নাই। ইন্দুবাবু বলেন যে এই সময়ে তিনি তাঁহার নিকট কিছুদিন সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। কালিদাস প্রভৃতি মহাকবির যে কোনো কাব্যের যে কোনও সর্গের একটি শ্লোক ধরাইয়া দিলে তিনি সেই অন্ধ অবস্থাতেই একের পর একটি করিয়া বহু শ্লোকের আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেন। সংস্কৃতে তাঁহার কিরূপ অধিকার ছিল তাহা ইহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়।

কৃষ্ণচন্দ্র উত্তম গায়ক ছিলেন না, কিন্তু সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। ভাবের সহিত তাঁহাকে সঙ্গীত করিতে যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে এখনও অনেকে জীবিত আছেন। একবার সেনহাটি বারোয়ারি তলায় সমস্ত রাত্রি কবির গান হইয়াছে; গ্রাম-শুদ্ধ লোক সেখানে রাত্রি জাগিয়া গান শুনিয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্রকে কেহ সেখানে দেখে নাই। সেনহাটির শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গান শুনিয়া গৃহে ফিরিবার সময় দেখেন বারোয়ারি তলার কিছু দূরে একটি ঝোপের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি লোকারণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে ভালবাসিতেন না। ঠিক যতটুকু দূরে থাকিলে সঙ্গীত উপভোগের ব্যাঘাত হয়না অথচ লোকারণ্যের বাহিরে থাকা যায় এমন স্থানে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শুধু গান শুনিতেন না, গানে মজিতেন। ইন্দুবাবু যখন ফিরিতেছিলেন তখন গান শেষ হইয়া গিয়াছে কিন্তু

কৃষ্ণচন্দ্র তখনো ভাবে বিভোর, সঙ্গীত তখনো তাঁহাকে তন্ময় করিয়া রাখিয়াছে। শেষ জীবনে তিনি অনেক সময় নির্জ্জনে অতিবাহিত করিতেন। রুদ্ধদ্বার গৃহে আত্মচিন্তায় তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হইত। আত্মীয় স্বজনের সহিত অনেক সময়ে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক বাক্য বিনিময় করিতেন না। পৌত্র, দৌহিত্র, জামাতা প্রভৃতির বিয়োগ-জনিত শোক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার একটি দৌহিত্র তাঁহার গৃহেই বিসূচিকা রোগে মারা যায়। বালকের মৃত্যুর পর যখন তাহার জননী মাথা খুঁড়িয়া, চুল ছিঁড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন তখন কৃষ্ণচন্দ্র কন্যার নিকটে গিয়া ধীর, প্রশান্তভাবে বলিলেন,—"মা, অমন ক'রো না, ভগবান যাহা করিয়াছেন মঙ্গলের জন্যই করিয়াছেন, তুমি আমি তাহার কি বুঝি বল ?"

কৃষ্ণচন্দ্র যশোহরের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার এক সরিকের সহিত ভূসম্পত্তি লইয়া তাঁহাদের গোলমাল চলিতেছিল। এই গোলমাল বহুদিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র এই সময়ে অতি ধীর ভাবে সকল দিক বুঝিয়া চলিয়াছিলেন। কোন প্রকারে সরিকদিগের প্রতি যাহাতে দুর্ব্ব্যবহার না হয় সেজন্য তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। এই সম্পত্তিসংক্রান্ত গোলমালের পূর্ব্বেও তিনি সরিকদিগের প্রতি যেরূপ অনুকূল ছিলেন পরেও সেই অনুকূল ভাব রক্ষা করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন।

সময়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে বাঙালী যেমন অনভ্যস্ত এমন বোধ হয় আর কেহ নহে। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন এ বিষয়ে কিছু উন্নতি হইয়াছে কিন্তু তথাপি সভা সমিতিতে যেরূপ সময়ের অপচয় হইয়া থাকে তাহা কাহারও অবিদিত নহে। সাড়ে পাঁচটার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর, সভাপতির সভাক্ষেত্রে উপস্থিত

হইতেই সাড়ে ছয়টা বাজিয়া যায়, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সভাপতি যদি আসিলেন ত তখন বক্তাদের খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র আজীবন সময়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। যাহাকে প্রকৃত-পক্ষে ইংরাজী শিক্ষা বলে তাহা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই, সুতরাং এ গুণ ইংরাজদিগের নিকট হইতে তিনি পাইয়াছিলেন এমন কথা বলা যায় না। কর্ম্মস্থানে তাঁহার কখনো যাইতে বিলম্ব হইত না; নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বেও তিনি যাইতেন না। অল্প সময় বাকী থাকিতে তিনি কর্ম্মস্থানে গিয়া উপস্থিত হইতেন। দীর্ঘ-কাল কর্ম্মের মধ্যে যশোহরে দুই একবার তাঁহার বিদ্যালয়ে যাইতে বিলম্ব হয় নাই এমন নহে। দুই মিনিট চারি মিনিটের বিলম্ব তিনি যে কয়বার করিয়াছিলেন সে দুই চারি মিনিট সময় তিনি বিদ্যালয়ের ছুটির পরও ছাত্রদের পড়াইয়া পোষাইয়া দিতেন। সাধারণতঃ তিনি বিদ্যালয়ের ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই পুস্তক বন্ধ করিতেন, কিন্তু যদি কখনো আসিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে তাহা হইলে তিনি বিদ্যালয়ের ছুটির পর পড়াইয়াছেন। এ সকল বিষয়ে তিনি অতিরিক্ত রকম কর্ত্তব্যপরায়ণ ও খাঁটি ছিলেন। শেষ বয়সে মানুষ অকর্ম্মণ্য ও কতকটা কর্ম্মবন্ধন সম্বন্ধে শিথিল হইয়া পড়ে। কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনে তাহা ঘটিতে পারে নাই। পল্লীগ্রামে বিবাহ বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে মধ্যাহ্নে আহারের নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে; কিন্তু কার্য্যতঃ এই নিমন্ত্রণ মধ্যাহ্নের না হইয়া অপরাহ্নেরই নিমন্ত্রণ। গ্রামের সকলেই তাহা জানে কাজেই মধ্যাহ্নে আহারের নিমন্ত্রণ থাকিলে কেহ মধ্যাহ্নে না গিয়া অপরাহ্নেই গিয়া থাকে। কৃষ্ণচন্দ্র কিন্তু ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় নিমন্ত্রণ বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইতেন এবং স্থিরভাবে একস্থানে বসিয়া থাকিতেন।

হয়ত বসিয়া থাকিতে থাকিতে অপরাহ্নও উত্তীর্ণ হইয়া যাইত তথাপি তিনি উঠিতেন না। কৃষ্ণচন্দ্র লোভী বা ঔদরিক ছিলেন না। লোককে সময়ের সদ্ব্যবহার শিক্ষা দিবার নিমিত্তই বোধ হয় তিনি এই-রূপ করিতেন। যদি এইরূপে অসময়ে বারবার নিমন্ত্রণ বাড়ীতে যাওয়ায় লোকে ওই নিমন্ত্রণপ্রথার দোষ বুঝিয়া সময়ের পরিবর্ত্তন করে তাহা হইলে একটি কলঙ্ক দূর হইবে, বোধ হয় তিনি ইহাই কল্পনা করিতেন।

কৃষ্ণচন্দ্র নিজে যেমন স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন তেমনি অন্যের স্বাধীনতাপ্রিয়তাকে ভাল বাসিতেন। এমন কি কীট পতঙ্গের স্বাধীনতাও তাঁহার নিকট সম্মানের বিষয় ছিল। একবার তিনি বাজার হইতে কয়েকটি খলিশা মাছ কিনিয়া আনিতে ছিলেন। মৎস্য-বিক্রেত্রী একটি কচু পাতার মধ্যে মাছ কয়টি বাঁধিয়া দিয়া-ছিল। মাছগুলি লইয়া যখন তিনি বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়াছেন তখন কচুপাতার মধ্যে মাছগুলি ছটফট করিতে আরম্ভ করিল। কৃষ্ণচন্দ্রের মনে আঘাত লাগিল; তিনি ভাবিলেন তাইত আমি ইহাদের স্বাধীনতা হরণ করিয়া কত ক্লেশ দিতেছি! যেই এই ভাব মনে আসিল অমনি তিনি সেই কচুপাতার বন্ধন খুলিয়া মাছগুলিকে পথিপার্শ্বস্থ পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দিলেন। নিমেষের মধ্যে তাহারা গভীর জলে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ভীষণ দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যেও তাঁহার মনে প্রবঞ্চনা করিবার ভাব আসিত না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতেও তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ সততার পরিচয় পাওয়া যাইত। একবার এক নদী পার হইবার জন্য তিনি খেয়া ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন খেয়ার নেয়ে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তিনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, তথাপি সে আসিল

না। পার হইবার জন্য অন্য লোকও জুটিল। কৃষ্ণচন্দ্র তাহাদের সহিত পার হইলেন। সকলে পার হইয়া "তাই তো খেয়ারী কোথায় গেল" এইরূপ দুই একবার বলিয়া স্বীয় স্বীয় গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। কৃষ্ণচন্দ্র খেয়ারীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। বহুক্ষণ পরেও যখন খেয়ারীর দেখা পাওয়া গেল না তখন তিনি এক টুকরা কাগজে "খেয়াপারের পয়সা" লিখিয়া মোড়কটি নৌকার গলুইএর উপর রাখিয়া দিয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। যেখানে তাঁহাকে কেহ দেখিতেছে না, যেখানে তাঁহার ধরা পড়িবার কোনো সম্ভাবনা নাই দারুণ অভাবের মধ্যেও তিনি সেখানে এমনি সৎ ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন!

অনেকের ন্যায় তাঁহার মতমাত্রে পর্য্যবসিত স্বাধীনতার জন্য কোন আগ্রহ ছিল না। যে স্বাধীনতায় স্বাবলম্বন শিক্ষা দেয় সেই স্বাধীনতা তাঁহার আকাঙ্খার সামগ্রী ছিল। নিতান্ত অশক্ত হইয়া না পড়া পর্য্যন্ত অন্ধ অবস্থাতেও তিনি নিজে নদী হইতে স্নান করিয়া আসিতেন, স্নানান্তে পরিধেয় বস্ত্রখানি স্বহস্তে স্রোতের জলে ধৌত করিয়া গৃহে আনিতেন। তিনি অক্লেশে এই সামান্য কাজটি বাড়ীর মেয়েদের জন্য ফেলিয়া রাখিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। যতক্ষণ তাঁহার শরীরে কিছুমাত্র শক্তি থাকিত ততক্ষণ তিনি কোনমতে অন্যের সাহায্য লইতেন না। অন্যকে সহজে কোন বিষয়ে পরের উপর নির্ভর করিতে দেখিলে তিনি সুখী হইতেন না। ১৩০২ বঙ্গাব্দে সেনহাটি বিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্র উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতকে বিদায় দিবার নিমিত্ত সমবেত হইয়া কিছু আয়োজন করেন। * ইহাতে স্থির হয় সংস্কৃত কবিতায় উক্ত পণ্ডিত মহাশয়কে

* ইঁহাদের মধ্যে বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত হীরালাল সেন এবং আরো কয়েকজন ছিলেন।

অভিনন্দন দেওয়া হইবে। ছাত্রদল কৃষ্ণচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। কৃষ্ণচন্দ্র সহজেই সম্মত হইলেন। কিন্তু যে দিন তিনি এ বিষয়ে সম্মত হইয়াছিলেন তাহার পর দিবস ছাত্রদল তাঁহার নিকটে গেলে তিনি বলিলেন, "কবিতার ভাব তোমরা যোগাইবে সেজন্য আমি তোমাদের সাহায্য করিব না। তোমাদের যাহা বক্তব্য তোমরা বলিয়া দাও আমি ছন্দে ও প্রকৃতিতে তাহাকে কবিতায় পরিণত করিব। ভাব দেওয়া তোমাদের কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে আমি তোমাদের সাহায্য করিতে পারি না, তোমাদের কর্ত্তব্যটুকু তোমরা এড়াইতে পারিবে না। আমার ভাব আমি দিব না।" ছাত্রদল বাঙলায় তাঁহাদের বক্তব্য লিখিয়া দিলে কৃষ্ণচন্দ্র পরে তাহা হইতে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। যে সভায় উক্ত পণ্ডিত মহাশয়কে বিদায় দেওয়া হয় সেই সভার সভাপতি ছাত্রদিগকে বলিয়াছিলেন, "কবিতাটি সুন্দর হইয়াছে কিন্তু মাঘ কিংবা ভারবির কবিতার ন্যায় ইহা কঠিন হইয়াছে; ইহার নিম্নে যদি টীকা দেওয়া থাকে তাহা হইলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে সুবিধা হয়।" ছাত্রদল এই কথা শুনিয়া ভয়ে-ভয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন; কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের বক্তব্য শুনিয়া বলিলেন, "আমি উহার জন্য যথেষ্ট খাটিয়াছি, যদি উহা এতই কঠিন হইয়া থাকে তবে তোমরা উহার নিম্নে টীকা করিয়া দাও।" কৃষ্ণচন্দ্র আর কোনমতে তাহাদের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। *

কৃষ্ণচন্দ্র ছবি তোলাইবার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। তিনি বাহ্যতঃ যেমন দীনবেশে থাকিতেন তাঁহার মনেও সেইরূপ দীনতার

* শ্রীযুক্ত হীরালাল সেন কথিত। ১৩০২ বঙ্গাব্দের বর্ষাকালে এই ঘটনা ঘটে।

ভাব সর্ব্বদা জাগরূক থাকিত। দীনতা ও হীনতা এক বস্তু নহে। নিজেকে অকিঞ্চন বলিয়া জানিলে যে বিনয়ের ভাব মানবের পক্ষে স্বাভাবিক হয় সেই ভাবটিকে দীনতা বলা যাইতে পারে। এই দীনতার ভাব চিরদিনই কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্রের ভূষণস্বরূপ ছিল। তাঁহার ছবি তুলিবার চেষ্টা অনেকবার করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতেন। প্রতিকৃতি গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিকে তিনি বলিতেন যে ছবি তুলিবার উপযুক্ত লোক থাকিতে তাঁহার ন্যায় অকিঞ্চনের ছবি তোলা নিতান্ত অন্যায় ও উপহাসের বিষয়। তাঁহার এইরূপ অনিচ্ছা ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও দুইবার তাঁহার ছবি তোলা হইয়াছিল। প্রথমবারের গৃহীত ছবিখানি নিতান্ত কুৎসিৎ হইয়াছিল। উহার বহুদিন পরে দ্বিতীয়বার তাঁহার ছবি গৃহীত হয়। ৺ কাশীভূষণ সেন ও শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সেন কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ছবি তুলিবার প্রস্তাব করিলে তিনি ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করেন। আপত্তির অন্যান্য যুক্তির মধ্যে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি গভর্ণমেণ্টের পেন্‌সন ভোগী, আমার ছবি তোলা গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নাও হইতে পারে।" ইহার উত্তরে উদ্যোগকর্ত্তৃগণ বলিলেন যে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন পেন্‌সন ভোগী হইয়াও ছবি তুলিতে দিয়াছেন এবং তাহা গভর্ণমেণ্টের দ্বারা অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। এই যুক্তিতে তিনি কতকটা নিরস্ত হইয়া বলিলেন, "এ বাদরের ছবি লইয়া কি হইবে?" ইহার পরও উদ্যোগকর্ত্তৃগণের আগ্রহ দেখিয়া তিনি বলিলেন, "পাঁচমিনিটের বেশি কোনমতেই বসিব না।" * তাঁহার ছবি তোলা ব্যাপার রামায়ণের একটি কাণ্ডবিশেষ বলিলেও হয়। বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হীরালাল সেন

* শ্রীযুক্ত হীরালাল সেন কথিত।

মহাশয় এই ছবি তুলিয়াছিলেন। পাঠক গ্রন্থমধ্যে এই চিত্রেরই প্রতিলিপি দেখিয়াছেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বলিয়াছেন, "কবিত্ব অপেক্ষা পিতৃদেবের সাধুতা অধিক ছিল।" এ কথার যাথার্থ্য আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। তাঁহার অদ্ভুত সত্যনিষ্ঠা, অলৌকিক ন্যায়পরতা, অকৃত্রিম বিনয়, অসামান্য আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান, বিচিত্র আত্মনির্ভরের ভাব, অশ্রুতপূর্ব্ব নিঃস্পৃহতা, এবং সর্ব্বোপরি অতুলনীয় ভগবদ্ভক্তির পরিচয় পাঠক নানা স্থানে পাইয়াছেন। তাঁহাকে শুধু কবি বলিলে তাঁহাকে অসম্মান করা হয়, তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান্ সাধক আমাদের দেশেই সম্ভবে। তিনি একাধারে কবি ও সাধক ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি সুরাপান করিতেন। নানাবিধ পাপনিরত ব্যক্তির সুরাপান ও তাঁহার সুঁরাপানে আকাশ-পাতাল প্রভেদ ছিল। তিনি ভাবে বিভোর হইবার জন্য অনেক সময়ে সুরাপান করিতেন, কাহারও ক্ষতি করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। শেষ জীবনে একবার সাঙ্ঘাতিকরূপে পীড়িত হইলে সুরা তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল, তাহার পর হইতেই তিনি আবার সুরার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র ঢাকা হইতে উন্মাদরোগ লইয়া চলিয়া আসিবার পূর্ব্বে তত্রত্য বাবু নন্দলাল গুহের নিকট সদ্ভাবশতকের স্বত্ব বিক্রয় করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু সদ্ভাবশতক ছাত্রবৃত্তির এবং বহু ইংরাজী বিদ্যালয়ের পাঠ্য গ্রন্থরূপে নির্ব্বাচিত হওয়ায় নন্দবাবু দেখিলেন উহার স্বত্ব লইয়া কারবার করা নিরাপদ নহে, কারণ গ্রন্থের স্বত্ব হস্তান্তর করণের দলিল রেজেষ্ট্রী করা হয় নাই। পরে ঐ দলিল সম্বন্ধে কোন গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে এই আশঙ্কায় নন্দবাবু রেজিষ্ট্রারের নিকট উক্ত দলিল রেজেষ্ট্রী করিবার জন্য আবেদন করেন। রেজি-

ষ্ট্রার উক্ত আবেদন পাইয়া কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি বিজ্ঞাপন-পত্র প্রেরণ করেন। ঐ বিজ্ঞাপন-পত্র লইয়া কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্ধুবান্ধবগণের সহিত পরামর্শ করিতে গেলে একজন বলিলেন, "তুমি রেজিষ্ট্রারের নিকট সময় প্রার্থনা কর তৎপরে কর্ত্তব্য স্থির করা যাইবে।" কৃষ্ণচন্দ্র নন্দবাবুর আবেদন বা এই বিজ্ঞাপন-পত্রের কিছুই জানিতেন না। যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে তাঁহার অজ্ঞাতসারে উমেশচন্দ্র এইরূপ করিয়াছেন তখন তিনি ক্রোধে অগ্নি-প্রায় হইলেন। নন্দবাবুকে তিনি পত্র দ্বারা জানাইলেন যে তাঁহার পুত্রের এইরূপ ব্যবহারে তিনি নিতান্ত দুঃখিত এবং বিরক্ত হইয়াছেন; তিনি সুস্থ শরীরে, অন্যের বিনানুরোধে, প্রকৃতিস্থ অবস্থায় উক্ত গ্রন্থের স্বত্ব বিক্রয় করিয়াছেন এ কথাও তিনি নূতন করিয়া উক্ত পত্রে উল্লেখ করিলেন। সুতরাং উমেশচন্দ্রের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। যে সময়ে এই স্বত্ব ফিরিয়া পাইবার, অথবা তদভাবে ক্ষতি-পূরণ স্বরূপে প্রচুর অর্থ পাইবার সুযোগ অপ্রত্যাশিতভাবে কৃষ্ণ-চন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল সে সময়ে তাঁহার গৃহে অর্থাভাবের চূড়ান্ত হইয়াছিল। কিন্তু অর্থাভাব দূরে থাকুক, অন্নাভাবে মৃত্যু হই-লেও তিনি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতেন না। বাক্যে, মনে ও কার্য্যে সত্যের প্রতি এমন অটল অনুরাগ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। *

তিনি নিজে যেমন সত্যের অনুরাগী সেবক ছিলেন অপরকেও সেইরূপ সত্যপ্রিয় দেখিতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা হইত। কাহাকেও মিথ্যা কহিতে কিংবা মিথ্যা আচরণ করিতে দেখিলে তাঁহার সহ্য হইত না। যে দুই কথা বলিত তাহাকে তিনি শত্রুবৎ পরিত্যাগ

---

* রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন বি, এল্ কথিত।

করিতেন; তাহার সহিত কোন রকম সম্বন্ধ তিনি রাখিতে চাহিতেন না। বাজারে কোন জিনিস কিনিতে গেলে তিনি দরদস্তর করিতেন না; ক্ষমতায় কুলাইলে বিক্রেতার প্রার্থিত মূল্যেই তিনি তাহা ক্রয় করিতেন, নতুবা তৎসম্বন্ধে দ্বিরুক্তি না করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন। সেনহাটি নিমু রায়ের বাজারে এক বস্ত্র বিক্রেতার দোকানে তিনি কাপড় কিনিতে গিয়াছিলেন। নিজের পছন্দমত কাপড় নির্ব্বাচন করিয়া তিনি তাহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন। বস্ত্রবিক্রেতা যে মূল্য বলিল তিনি সেই মূল্যে উক্ত বস্ত্র ক্রয় করিয়া দোকান হইতে বাহির হইয়া যাইবেন এমন সময় দোকানদার বলিল, "কর্ত্তা কাপড়ের দাম আমরা ঐরূপই বলিয়া থাকি, কিন্তু উহার প্রকৃত মূল্য উহা অপেক্ষা কম।" এই কথা শুনিবামাত্র তিনি কাপড় রাখিয়া অন্য দোকানে গেলেন। উক্ত দোকানদার কত অনুনয় করিল কিছুতেই তিনি আর ফিরিলেন না। তাঁহার জীবনে আর কখনো তিনি সেই দোকানে যান নাই। তাঁহার পুত্র উমেশচন্দ্র বলেন যে কৃষ্ণচন্দ্রের এই উচ্চ আদর্শ তাঁহাদের পরিবারের সকলে গ্রহণ করিতে পারেন নাই এই জন্য অনেক সময়ে তিনি ম্রিয়মাণ থাকিতেন। সময়ে সময়ে এই জন্যই পরিবারস্থ সকলের প্রতি তিনি রুক্ষ ব্যবহার করিতেন। যে জননী ও ভগ্নীকে তিনি দেবীজ্ঞানে পূজা করিতেন অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে এই উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিতে বিমুখ দেখিলে তিনি তাঁহাদের প্রতিও বিরূপ হইতেন। *

স্বভাববিনয়ী কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত যশোহর ষ্টেশনে একবার নড়াইল মুন্সেফ আদালতের সেরেস্তাদার মুন্সী সাদেক সাহেবের ঘটনাক্রমে পরিচয় হইয়া যায়। বলা বাহুল্য উক্ত মুন্সীজির আগ্রহেই

---

* শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃহীত।

এই পরিচয় সংসাধিত হইয়াছিল; কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং নিতান্ত স্বল্প-ভাষী ও অসামাজিক ছিলেন। উক্ত মুন্সীজি কৃষ্ণচন্দ্রকে স্বীয় পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত দেখিয়া একটি পারস্য ভাষার বয়েৎ আবৃত্তি করিলেন। উহার অর্থ এই:—মণি কাপড়ে আচ্ছাদিত থাকিলে তাহার জ্যোতি বাহির হইতে পারে না। উত্তরে কৃষ্ণচন্দ্র একটি বয়েৎ আবৃত্তি করিলেন; তাহার অর্থ এই:—দূর হইতে ঢাক বাজিতে থাকিলে উহার বাজনা শুনিয়া উহার গুরুত্ব বড় বেশি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু নিকটে গিয়া দেখিলে দেখা যায় উহার ভিতর ফাঁপা। *

কৃষ্ণচন্দ্রের বংশ শক্তি-উপাসক। বাল্যকাল হইতে তিনি শক্তি-উপাসনার পক্ষপাতী ছিলেন। এক সময়ে তিনি কোন বন্ধুর পরামর্শ ও দৃষ্টান্তে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী হন কিন্তু পরে আবার শক্তি-উপাসক হইয়াছিলেন। সে সময়ে কালীর প্রতি তাঁহার গভীর ভক্তি জন্মিয়াছিল এবং "কালী অকূল সাগরে কূল আর দেখিনে" এই গানটি তাঁহার উপাসনার প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। ইহার পরে অক্ষয় কুমার দত্তের "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" পাঠে তাঁহার ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন হয়। এ সময়ে তিনি ঢাকায় অবস্থান করিতেছিলেন। ঢাকার ৺ব্রজসুন্দর মিত্রের বাটী তৎকালে সকল প্রকার শুভ অনুষ্ঠানের জন্মভূমি ছিল বলিলে হয়। কৃষ্ণচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন, ব্রাহ্ম উপাচার্য্যের কার্য্যও করিতেন। ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি সময়ে সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতাও করিতেন। † কিন্তু তখন তাঁহার বক্তৃতা তেমন ভালো হইত না, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। ব্রজ-

* কবির পুত্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃহীত।

† মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন কথিত।

সুন্দর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম স্কুলেও তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। যে ধর্ম্মক্ষেত্র প্রথমে ব্রজসুন্দর, কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি কর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন, সেই ক্ষেত্রে পরে সাধু অঘোর নাথ ও ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ভক্তির বীজ বপন করিয়াছিলেন। যে ভক্তি-আন্দোলনে ঢাকা দ্বিতীয় নবদ্বীপ-সদৃশ হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বাভাস কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির দ্বারাই সূচিত হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র ঢাকা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবার পর ১২৭৬ বঙ্গাব্দে পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট যখন যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইত, তিনি বিনা দ্বিধায় তাহার অনুসরণ করিতেন। তাঁহার নিকট যখন যে ধর্ম্ম বা যে সাধন-পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইয়াছে, তিনি অবাধে তখন সেই ধর্ম্ম ও সাধন-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন; ইহাতে লোকে কি বলিবে, সে জন্য ইতস্ততঃ করেন নাই। সামাজিক ব্যাপারেও তিনি নিজের স্বাধীন মত রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাঁহার এক কন্যা বিবাহের বয়স প্রাপ্ত হইলেও (সম্ভবতঃ উক্ত কন্যার বয়স চৌদ্দ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল) তিনি তাহার বিবাহ সম্বন্ধে উদাসীন দেখিয়া আত্মীয় স্বজনগণ ব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং তাহার বিবাহের জন্য কৃষ্ণচন্দ্রকে তাগিদ দেন। কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন, "কন্যা এখনও বিবাহের বয়স প্রাপ্ত হয় নাই, আরো কিছুদিন অনূঢ়া থাকুক্।" অবশেষে আত্মীয় স্বজন গোপনে কন্যার বিবাহ স্থির করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে তাহা জ্ঞাপন করেন। সৌভাগ্যের বিষয় কৃষ্ণচন্দ্রের স্বভাবসুলভ জিদের ভাব এই ঘটনায় প্রকাশ পায় নাই, বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছিল। *

যাঁহারা কৃষ্ণচন্দ্রকে মদমত্ত অবস্থায় সেনহাটির পথে স্বরচিত সঙ্গীত

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত এম্.এ মহাশয় কথিত।

গায়িতে গায়িতে উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিয়াছেন, "এই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিলে আমার ভক্ত রামপ্রসাদ সেনের কথা মনে হইত, বাস্তবিক তিনি মদে মাতাল হইতেন না, ভক্তিমদেই তাঁহাকে অধিক বিহ্বল করিত।

কৃষ্ণচন্দ্রের একটি বন্ধুর কথা এ অধ্যায়ে উল্লেখ না করিলে গ্রন্থ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত গণেশ চন্দ্র সেন। ইনি নিতান্ত বৃদ্ধ এবং লুপ্তদৃষ্টি হইলেও যুবকের ন্যায় উৎসাহী। কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া ইঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইনি নানা সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইলেও নিরহঙ্কার এবং একাধারে ভাবুক ও শিশুর মত বিনয়ী। কৃষ্ণচন্দ্রের প্রসঙ্গে ইনি পরম আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে আমাদের অনুরোধে তিনি যথেষ্ট অনুরাগ ও ভাবের সহিত কৃষ্ণচন্দ্র-রচিত দুইটি সঙ্গীত গায়িলেন। সঙ্গীত দুইটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

রাগিণী বেহাগ—তাল পোস্ত।

(রে মন) কাব্য সরোবরে
গমনেচ্ছা থাকে যদি, এস ত্বরা ক'রে।
সুকল্পনায় সরসীর, বাঁধা আছে চারি তীর,
তাহে মনোহর নীর অতি নিরমল;
নানা ছন্দ হংসগণ, করে তাহে বিচরণ
সে ঘাটে করিলে স্নান দুর্ম্মতি হরণ করে।
সম্ভাব-সরোজ যার শোভা করে অনিবার
মকরন্দে পরিপূর্ণ সে সরোজ-দল;
সে মধু অপেক্ষা মধু হয় কি মন পদ্ম মধু
ভাবুক ভ্রমর সেই মধুপান করে॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কি বেশ ধরেছ আজি শারদীয়া নিশীথিনী,
কৌমুদী-বসনে পূর্ণ কলানাথ কিরীটিনী।
উজ্জ্বল তারকারাজি, কুণ্ডল শোভিছে কিবা,
ছায়াপথ সীমন্তেতে জনমনোমোহিনী।
প্রশান্ত প্রসন্নাননে, হাসায়ে জগত-জনে
মোহিত করেছ নাকি হৃদয়ানন্দদায়িনী ;
কে তোমারে এই সাজে সাজায়েছে বল সখি,
কোথায় জননী তব সবার জননী যিনি ? *

এ সঙ্গীত দুইটির সমালোচনা অনাবশ্যক। কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। অনেক সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র তবলা বাজাইতেন এবং গণেশ চন্দ্র সঙ্গীত করিতেন। বাদ্যে কৃষ্ণচন্দ্র যে বিশেষ পটু ছিলেন, তাহা নহে ; কিন্তু তিনি রসজ্ঞ শ্রোতা বলিয়া তাঁহার ওস্তাদির অভাবটুকু অনুভূত হইত না। একবার দৌলতপুর কলেজের ঘাট হইতে নৌকায় সেনহাটি যাত্রাকালে খেয়াঘাটে এক বস্ত্রব্যবসায়ীর সহিত বর্ত্তমান জীবনচরিত লেখকের পরিচয় হয়। ইঁহার নাম শ্রীমহানন্দ দাস। আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে পরিচয় দিলাম। তখন তিনি আমার সেনহাটি গমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন-চরিত লিখিতেছি শুনিয়া তিনি বিশেষ আগ্রহ করিয়া আমাকে তাঁহার দোকানে লইয়া গেলেন। কৃষ্ণচন্দ্র প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "একবার মজুমদার মহাশয় আমার দোকান হইতে একখানি গামোছা ক্রয়

* গণেশবাবু বলিলেন এ গানটি কৃষ্ণচন্দ্রের রচিত। দেখা যাইতেছে ব্রহ্ম সঙ্গীতগ্রন্থের প্রকৃতিসম্বন্ধীয় শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের অনেকগুলি কৃষ্ণচন্দ্রের রচনা।

করিয়া লইয়া যান ; উক্ত গামোছাখানি অন্যান্য দোকান হইতে ক্রীত গামোছা অপেক্ষা অধিকদিন টিকিয়াছিল, এইজন্য গামোছার প্রয়োজন হইলে তিনি অন্ধাবস্থাতেও লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আমার দোকানে আসিতেন। আমার প্রতি তাঁহার একটু স্নেহও জন্মিয়াছিল। এই নিমিত্তে একদিন তিনি আমার দোকানে আসিলে আমি বলিলাম, 'মজুমদার মশাই, আপনি একজন মানুষের মত মানুষ, আপনি কেন মদ খান?' মজুমদার মহাশয় তাহার উত্তরে বলিলেন, 'মহানন্দবাবু, আমি কি মদ খাই? আমি মদ খাই না। হাফিজ যে মদ খাইতেন, আমি সেই মদ খাই। হাফিজ জানেন?' এই বলিয়া তিনি গদ্‌গদকণ্ঠে হাফিজ আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে দৃশ্যে সকলে মুগ্ধ হইয়া গেল, কাহারও কাহারও চক্ষে অশ্রুবিন্দু ফুটিল।"

কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় আত্মচরিতে জীবনের পাপ স্বীকার করিয়া আপনার ক্ষুদ্রতা প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে গ্রন্থ তাঁহার কীর্তিস্তম্ভ-স্বরূপ হইয়াছে ; অবিদিত-চরিত্র জটাজূটধারী সাধু অপেক্ষা বিদিত-চরিত্র সংসারী কৃষ্ণচন্দ্রকে পাঠক অধিক শ্রদ্ধা করিতে পারিবেন, এ কথা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

কৃষ্ণচন্দ্রের শেষ জীবন বিশৃঙ্খলভাবেই কাটিতেছিল। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে তিনি সকলি হারাইয়াছিলেন, কেবল তাঁহার চির-সাধনার ধন ভগবানের নামটি তিনি হারান নাই। সে প্রিয় নাম তাহার জপমন্ত্র হইয়াছিল। তাঁহার চক্ষের দৃষ্টি গিয়াছিল, তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু অন্য এক রাজ্যের আলোকে তাঁহার চক্ষের দৃষ্টি লোপ পাইতে দেয় নাই, বরং তাঁহাকে এক অদৃশ্য রাজ্যের সহিত

পরিচিত করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার কর্ণ এক অকর্ণশ্রুত বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। তাঁহার গৃহে মৃত্যু বহুবার আতিথ্য স্বীকার করিয়া সকলকে শোকাভিভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু হিমালয়ের তুষার-শোভিত অটল গিরিশৃঙ্গের ন্যায় তাঁহার স্থৈর্য্য ও চিত্তের শুভ্রতা কখনও দূর করিতে সমর্থ হয় নাই। পরলোক সম্বন্ধে তাঁহার গভীর বিশ্বাস ছিল। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি পৌত্রশোক পাইয়াছিলেন। এই বালক আট বৎসরের হইয়াছিল। ইহার মৃত্যুর পর কেহ কাঁদিলে তিনি বলিতেন, "ইন্দু মরে নাই, সে আছে, তোমরা কাঁদ কেন?" উমেশচন্দ্রের পুত্রের নাম "ইন্দু" ছিল। *

ক্রমে বিশ্বাসী ও সাধক কৃষ্ণচন্দ্রের মর্ত্ত্যলীলা শেষ হইয়া আসিল। লোকচক্ষুর অগোচরে প্রস্ফুটিত বনকুসুমের মত সমগ্র দেশকে অজ্ঞাতসারে সৌরভে আমোদিত করিয়া তাঁহার জীবন-পুষ্প ঝরিয়া পড়িবার দিন আসিল। কিছুদিন হইতে তিনি রোগে অল্পাধিক ক্লেশ পাইতেছিলেন। এইরূপে ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ২৯শে পৌষ প্রত্যূষে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শ্লেষ্মাঘটিত জ্বররোগে উনসপ্ততি বর্ষ বয়সে স্বীয় জন্মভূমি সেনহাটির ক্রোড়ে তিনি সজ্ঞানে দেহ ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বরাত্রে তিনি সারা রজনী সাধক রামপ্রসাদ ও দাশরথি রায়ের নানাবিধ ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীত অক্লান্তকণ্ঠে গায়িয়াছিলেন, কেহ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। মিশরদেশীয় মরাল যেমন আকুল সঙ্গীতে দশদিক্ পূর্ণ করিয়া ছিন্নকণ্ঠে নীল নদের কোলে ঢলিয়া পড়ে, কবি কৃষ্ণচন্দ্র তেমনি পরিপূর্ণ হৃদয়ে সঙ্গীত করিতে করিতে তাঁহার জন্মভূমির কোলে চিরবিশ্রাম লাভ করিলেন। সেনহাটি কাঁদিল, বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজ কাঁদিল, কাব্যরসগ্রাহী যে যেখানে ছিল, সেই দুই বিন্দু

* শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবীর প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃহীত।

অশ্রু ফেলিল, আর বঙ্গের কবিসমাজে একটী অন্তর্ভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পতিত হইল। সে দিন পৌষ সংক্রান্তির দিন, তাহার উপর সূর্য্য-গ্রহণ ছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই উমেশচন্দ্র গৃহে আসিয়াছিলেন। একমাত্র পুত্রের সহিত মৃত্যুকালে কৃষ্ণচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয় নাই; তিনি যাঁহার আশ্রয় লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাঁহার অভয় ক্রোড় আর পৃথিবীর আত্মীয় স্বজনের বন্ধনের মধ্যে তাঁহাকে থাকিতে দিল না; পৃথিবীর বিদায় পূর্ণাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই দিব্যলোকে তাঁহার অভ্যর্থনা সূচিত হইল।

সেনহাটি, আজ তোমার কাঁদিবার দিন! যে রত্ন ক্রোড়ে করিয়া তুমি ধন্য হইয়াছিলে, যে রত্ন বাল্যে তোমার বক্ষ আলোকিত করিয়াছে, যৌবনে তোমার নামকে বঙ্গদেশের নিকট উজ্জ্বল করিয়াছে, প্রৌঢ়াবস্থায় ও অন্তিমে তোমাকে লোকসমাজে তীর্থস্থান বলিয়া পরিচিত করিয়া দিয়াছে, তোমার সেই অমূল্য নিধি আজ তোমার ক্রোড় শূন্য করিয়া শ্মশানের ধূলায় পরিণত হইতে চলিল, আজ তুমি কাঁদ। পণ্ডিত ও সাধুদিগের জন্মভূমি সেনহাটি, তোমার অন্যতম পণ্ডিত ও সাধক সন্তান মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিয়া অমরলোকে প্রযাণ করিতেছেন, আজ তুমি কাঁদ। আজ বালক, বৃদ্ধ, যুবা, নরনারী সকলে দুই ফোঁটা অশ্রুজল ফেল, তোমাদের আদরের ধন, গৌরবের সামগ্রী কৃষ্ণচন্দ্র আর এ জগতে নাই! আজ কি শুধু সেনহাটির পক্ষেই শোকের দিন? ঐ যে অনন্ত আকাশে অমিততেজ সূর্য্য আজ রাহু-গ্রস্ত হইয়া মলিন হইয়া পড়িয়াছেন, সমস্ত প্রকৃতি অসময়ে সন্ধ্যার বেশ পরিধান করিয়াছেন ইহা কি শুধু সেনহাটির দুঃখে? প্রতিদিন কত লোক মরে, প্রতিদিন কি সূর্য্যগ্রহণ হয়? সেনহাটিতে আরো কত লোক মরিয়াছে, কিন্তু তাহাদের শ্মশান যাত্রাকালে প্রকৃতির এমন

অবসাদ কেহ কখনো দেখে নাই। কৃষ্ণচন্দ্র শুধু সেনহাটির নয়, তিনি বিশ্বের, তিনি বিশ্বের না হইলে বিশ্বপ্রকাশক সূর্য্য কি তাঁহার তিরোধানে মুখ লুকাইতেন? তিনি বঙ্গের কবি, কিন্তু তাঁহার অমূল্য জীবন বিশ্বের সম্পত্তি। আজ সেনহাটির বিশেষ ভাবে কাঁদিবার দিন, কিন্তু তাহার সহিত সমস্ত বাঙ্‌লা দেশ আজ অশ্রুজল ফেলুক্,—কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গের—ভারতের সুসন্তান। তাঁহার তিরোধানে সমগ্র বঙ্গদেশ কাঁদিলে সেনহাটির শোকের লাঘব হইবে। পরস্পরের সহিত মিলিয়া গলাগলি করিয়া কাঁদিয়াও সুখ আছে।

যাও কৃষ্ণচন্দ্র, যেখানে অখণ্ড ন্যায়, অম্লান সত্য, অনন্ত জ্ঞান, নিষ্কলঙ্ক প্রেম, শাশ্বত শান্তি এবং ভূমানন্দ নিত্য বিরাজিত, সেই রাজ্যে তোমার কুটির বাঁধ। এ পৃথিবীতে তুমি অনেক সহিয়াছ। যে অক্ষয় আনন্দলোকে গৃহ বাঁধিবে বলিয়া তুমি ব্যাকুল হইয়াছিলে, আজ তোমার চিন্ময় আত্মা সেই অভীপ্সিত রাজ্যে চিরশান্তি লাভ করুক্, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।



দশম অধ্যায়।

উপসংহার।

কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত শেষ হইল। জীবনবৃত্তান্তের যেখানে শেষ, জীবনের শেষ সেখানেই নহে; সে কথা প্রথম অধ্যায়েই বলা গিয়াছে। সাধু পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া, সাধ্বী জননীর ক্রোড়ে তিনি লালিত পালিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন বক্সী মহাশয়ের ন্যায় সাধু শিক্ষকের প্রভাব তিনি জীবনে লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত সেন মহাশয় এখনো জীবিত আছেন এবং কাশীতে অবস্থান করিতেছেন। ইঁহার সাধুতা, ন্যায়পরতা, দানশীলতা সেনহাটিতে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। সেনহাটির বাজারের অনতিদূরে অবস্থিত শ্মশানেও উক্ত সেন মহাশয়ের দানশীল হস্তের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্মশানে দাহকারীদিগের অসুবিধা হইত, এই জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে নানা সৎ কার্য্যে তিনি গোপনে বহু অর্থ দান করিয়া এক্ষণে জীবনের শেষভাগে কাশীতে অবস্থিতি করিতেছেন। এইরূপ শিক্ষকের চরিত্র-প্রভাব কখনো শিষ্যের জীবনে ব্যর্থ হইতে পারে না। কৃষ্ণচন্দ্র অতি অল্পদিনই গিরিশচন্দ্রের নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বারুদ ভালো হইলে এক পলকের মধ্যেই তাহাতে অগ্নি সংযোগ করা সম্ভব হইতে পারে। সেই অল্প সময়ের

মধ্যেই গিরিশচন্দ্রের চরিত্র-নিহিত বহ্নি কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনে সংক্রামিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের ন্যায়ানুরাগ কৃষ্ণচন্দ্র বিশেষভাবে লাভ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের ফসলও যে কোনো শিক্ষাগুরুর (educationist) পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। তাঁহার ছাত্রদল কর্ম্মসূত্রে বঙ্গের নানা স্থানে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের অনেকেই সাধারণের নিকট সুপরিচিত। বীজগণিত-প্রণেতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু মহাশয়ের নাম বিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে অধ্যাপক পর্য্যন্ত কাহারও নিকট অবিদিত নহে। বসু মহাশয় এখনো বাল্যের শিক্ষাদাতা মজুমদার-কবির নাম শুনিলে ভক্তিতে গদগদ-কণ্ঠে তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান জীবনচরিত-লেখককে তিনি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "I had great admiration and respect for the man, and my only regret is that I failed to take the necessary pains to pay my personal respects to him after I left school, and this regret will last till the end of my life." অর্থাৎ মানুষ হিসাবে তাঁহার প্রতি আমার গভীর অনুরাগ ও ভক্তি ছিল, এবং আমার একমাত্র দুঃখ এই যে আমি বিদ্যালয় ত্যাগ করিবার পর আমার ব্যক্তিগত ভক্তি আমি তাঁহাকে জানাইতে পারি নাই; মৃত্যুকালেও আমার এ ক্ষোভ থাকিয়া যাইবে। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ছাত্র ছিলেন, পাঠক এ কথা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। জগদীশ বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—"তিনি যখন ক্লাশে অধ্যাপনা করিতেন, তখন আমরা কতই গোলমাল করিতাম; কিন্তু সেই স্নেহময় ক্ষমাশীল গুরু কখনই তজ্জন্য শাস্তি



অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু এম, এ।

Printed by K. V. Seyne & Bros.

দিতেন না—এ কথা স্মরণ করিয়া এখন অনেক সময়ে বড়ই অনুতপ্ত হইয়া থাকি। * * * সেই শান্ত গম্ভীর চিন্তাশীল মূর্ত্তিখানি দূর হইতে ভক্তিভরে দেখিতাম কাছে গিয়া সাহস করিয়া কিছু বলিতাম না। কাজেই তখন কিছুতেই বুঝিতে পারিতাম না যে, তিনি আমাদিগকে স্নেহ করেন বা আমাদের নামটি পর্য্যন্ত জানেন। সংস্কৃতে আমার একটু অনুরাগ দেখিয়া কত যত্নে আমাকে শিখাইতেন, তাহা আর এ জীবনে ভুলিব না। * * * তাঁর গৃহখানি দেখিলে ঋষির আশ্রম মনে হইত। রাস্তায় চলিতে চলিতে সেই মূর্ত্তিখানি দেখিলে বুদ্ধদেবকে কেন যেন মনে পড়িত। * * * অনেক সময়ে দেখিতাম, ক্লাশের মধ্যে চটি জুতা পায়ে, থানফাড়া চাদর গায়ে, একখানি প্রস্তর-মূর্ত্তি দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির উপর মুখখানি রাখিয়া কি যে এক গম্ভীর ধ্যানে রহিয়াছেন। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাস্য বিষয় সম্বন্ধে এমন গবেষণাপূর্ণ যুক্তিদৃষ্টান্ত-সহ ব্যাখ্যা দিতেন যে, অবাক হইয়া শুনিতাম, আর ভাবিতাম, এত পাণ্ডিত্যের কেহ মূল্য বুঝিল না! আমাকে যে তিনি নাম ধরিয়া চিনিতেন বা স্নেহ করিতেন, সে কথা মাত্র তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, যখন তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে কলিকাতায় প্রবাস করি। আমরা পরস্পরের নিকট সংস্কৃতে চিঠি পত্র লিখিতাম, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার চিঠিগুলি এখন নাই। দ্বৈভাষিকী নামে একখানি পত্রিকা বাহির করিয়া অযাচিত ভাবে আমাকে পাঠাইয়া দিতেন। তখন বুঝিলাম যে এত দীর্ঘ কালেও তাঁহার স্মৃতিপথ হইতে ও স্নেহ হইতে বিদূরিত হই নাই। শুনিয়াছি, তিনি একবার একদিনেই * * * মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে কোনদিনই মাদক সেবন করিতে দেখি নাই। দেখিলেও আমার ভক্তি টুটিত না, তিনি মহাদেব

ছিলেন, মনে হইত।” যশোহরের বিখ্যাত উকিল, শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুরও কৃষ্ণচন্দ্রের প্রসঙ্গ পাইলে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যান। আমরা তাঁহাকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়াছি। কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন, “যশ, অর্থ, সম্মানাদির প্রতি তাঁহার কোন প্রকার আসক্তি ছিল না, তিনি নিষ্কামভাবে তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি করিয়া যাইতেন। * * * আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় কবি-বর বৌদ্ধ দর্শন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নে শ্রম করিতেন এবং বুদ্ধ-দেবকেই যেন জীবনের আদর্শ-স্বরূপ করিয়াছিলেন। * * * তাঁহার শেষ-জীবনে যে সমুদয় দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা এইক্ষণে দেখিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সেগুলি পাওয়া যায় কিনা জানি না।”

কৃষ্ণচন্দ্রের ছাত্রগণ যেমন তাঁহার প্রভাব লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার গ্রামবাসী অনেক যুবকও তাঁহার চরিত্রের প্রভাব লাভ করিয়াছিলেন। সুধী ৺ অম্বিকাচরণ সেন, “সখা” নামক মাসিক পত্রের প্রবর্ত্তক, অক্লান্তকর্ম্মা ৺ প্রমদাচরণ সেন, সাধু ৺ ত্রিগুণাচরণ সেন প্রভৃতি এবং জীবিতদিগের মধ্যে প্রৌঢ়, যুবক ও বালক অনেকেই কৃষ্ণচন্দ্রের প্রভাব লাভ করিয়াছেন। ১২৮৯ বঙ্গাব্দে স্বর্গীয় প্রমদা-চরণ “সখা” প্রকাশিত করেন। উহাতে “সহজে কি বড়লোক হওয়া যায়?” এই নামে ধারাবাহিক রূপে একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের আত্মচরিতে প্রদত্ত বাল্যের যে পলায়ন-কাহিনী আছে, তাহার সহিত ঐ গল্পটির বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশতঃই তিনি তাঁহাকে তাঁহার গল্পের নায়করূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। পুরাতন “সখা” এখন দুষ্প্রাপ্য বলিলে হয়। যাঁহারা প্রমদাচরণের উক্ত গল্প পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণচন্দ্রের পলায়ন-কাহিনীর সহিত উহার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাই-

বেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত পলায়ন-ব্যাপারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে এক সময়ে কৃষ্ণচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল, পাঠক তাহা অবগত আছেন। তাঁহার বন্ধু সুপ্রাচীন শ্রীযুক্ত শ্যামলাল সেন মুন্সী মহাশয় একবার স্ত্রীশিক্ষার ঔচিত্যানৌচিত্য বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে কৃষ্ণচন্দ্র উক্ত সেন মহাশয়ের নিকট বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন এবং প্রবন্ধটি যাহাতে মুদ্রিত করা হয়, সেজন্য অনুরোধ করেন। সেন মহাশয় তাহাতে সম্মত হইয়া মজুমদার-কবির উপর উক্ত প্রবন্ধ মুদ্রিত করিবার ভার দেন। তখনকার দিনে নগরে নগরে মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হয় নাই, কিন্তু তথাপি স্ত্রীশিক্ষার প্রতি অনুরাগবশতঃ তিনি উক্ত প্রবন্ধ মুদ্রাঙ্কনের ভার গ্রহণ করিয়া তাহা সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।* সেনহাটিতে ভদ্র পরিবারে বাঙ্‌লা ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন নাই এমন রমণী বিরল।

কৃষ্ণচন্দ্রকে কেহ কেহ "অজাতশত্রু" বলিয়া থাকেন। বাস্তবিকই তাঁহার কেহ শত্রু ছিল না, তিনিও কাহারো শত্রু ছিলেন না। যদি কখনো কাহারো সহিত তাঁহার মতভেদ হইয়া থাকে, তাহা মতভেদ মাত্রই থাকিয়াছে; অনেকের পক্ষে মতভেদ যেমন শত্রুতায় পরিণত হয়, কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনে তাহা হয় নাই। সেনহাটি, যশোহর, ঢাকা, খুলনা, যেখানে যাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, লোকে বলিয়াছে, "অমন লোক আর হইবে না।" একবার সেনহাটিতে কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করিবার মানসে এক কর্ম্মকারের দোকানে গিয়া উঠিয়াছিলাম। দুই এক কথার পর কৃষ্ণচন্দ্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। কর্ম্মকার

* শ্রীযুক্ত শ্যামলাল সেন মুন্সী মহাশয় কথিত।

তাহার পুত্রের সহিত লোহা পিটিতেছিল, কৃষ্ণচন্দ্রের নাম হইবামাত্র লাফাইয়া উঠিল; বলিল, "মশায়, অমন লোক কি আর হয় ?" আমি বলিলাম, "শুনেছি তিনি মদ খেতেন, তাঁকে তোমরা কিরূপে ভালো বল ?" কর্ম্মকার ও কর্ম্মকার-পুত্র উভয়েই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বলিল, "আপনি কোথাকার লোক ? মজুমদার-মশায়ের নামে নিন্দে করে এমন লোকের সঙ্গে আমরা কথা কইনে। আপনি বিদেশী লোক,আপনি তাঁর কি জানেন ? আমরা জ'ন্মে অবধি তাঁকে দেখেছি। তাঁর মত সাধু লোক দেশে আর দেখিনি।"

যখন সেনহাটিতে কৃষ্ণচন্দ্রের অভ্যুদয় হয়, তখনকার গ্রামের অবস্থা ও বর্ত্তমান অবস্থায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। সেনহাটির সংস্কৃত চর্চ্চা বহুল পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। সেনহাটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে অনেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। কত লোকের স্বার্থত্যাগের ফলে বর্ত্তমান বিদ্যালয়টি সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। রামকুমার সরকারের ন্যায় কোন গুরুমহাশয় আর নিত্য নূতন গান বাঁধিয়া সেনহাটিকে আনন্দ দান করে না। সে স্পষ্টবাদিতার যুগ একপ্রকার বিদায় লইয়াছে বলিলে হয়। সুপ্রতিষ্ঠ কবিরাজদিগের অন্তর্ধানের পর তাঁহাদের স্থান পূর্ণ করিবার লোক আর দেখা যাইতেছে না। রাম-কুমার-রচিত "কুইনাইন-মাহাত্ম্য" সঙ্গীতেই তাহার পূর্ব্বাভাস সূচিত হইয়াছিল। বৈদ্যপ্রধান সেনহাটিতে এক্ষণে এলোপ্যাথি ও হোমিও-প্যাথির যুগ আরম্ভ হইয়াছে। গ্রামের উপর সরকারী দাতব্য ঔষধা-লয়ের প্রতিষ্ঠা উল্লিখিত কথারই সাক্ষ্য দিতেছে। গ্রামের পূর্ব্বের সে স্বাস্থ্য নাই। স্বাস্থ্যের প্রাচীন দুর্গে এক্ষণে ম্যালেরিয়ার জয়-

পতাকা উড্ডীন হইয়াছে। কিন্তু সকল বিষয়েই যে অবনতি হইয়াছে, এ কথা বলিতে পারা যায় না। যেমন একদিকে কতকগুলি বিষয়ে অবনতি হইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে কতকগুলি বিষয়ে অদ্ভুত উন্নতি দেখা যাইতেছে। পরহিতব্রত, জ্ঞানী, নিরহঙ্কার একদল নূতন লোক নূতন ভাবে দেশের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের অকৃত্রিম স্বার্থত্যাগ ও স্বদেশ-সেবা কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না।

কৃষ্ণচন্দ্রের রচিত গ্রন্থাবলীর নাম স্থানান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার আরও কয়েকখানি গ্রন্থের নাম পরে জানিতে পারা গিয়াছে। এই গুলির মধ্যে সংস্কৃতে রচিত চম্পূকাব্যম্, ছাত্রনীতি এবং সঙ্গীত-বীথিকার নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার হস্তলিখিত গ্রন্থগুলি তদীয় সহধর্ম্মিণী যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছেন। সেগুলি কোনদিন মুদ্রাযন্ত্রের মুখাবলোকন করিবে কি না, সন্দেহ। তাঁহার রচিত সংস্কৃত কাব্য ও নাটকগুলি মুদ্রিত হইলে সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার স্থান কোথায়, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য বিচক্ষণ বিচারকের সাহায্য আবশ্যক হইত। বাঙালীর গৃহে গৃহে যেমন স্মরণাতীত কাল হইতে অসংখ্য পুঁথি কীটের ক্ষুধা নিবারণ করিয়া আসিয়াছে, হয়ত কৃষ্ণচন্দ্রের চিরজীবনের সাধনার ধন এই গ্রন্থগুলি কীটের করাল কবলের প্রতীক্ষায় তেমনি দিন গণনা করিতেছে।

কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুতে সেনহাটিতে হাহাকার উঠিয়াছিল। বালক বৃদ্ধ যুবক, বৃদ্ধা প্রৌঢ়া-বালিকা, দোকানী পশারী, শিক্ষিত অশিক্ষিত যে যেখানে ছিল, সে-ই মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া "হায়! কি হইল," বলিয়া ক্ষণকাল নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তার পর সকলে শ্মশানাভিমুখে ছুটিল। যে রত্ন সহজলব্ধ বলিয়া তাহারা কোনদিন সম্যক্‌রূপে তাহার মর্য্যাদা বুঝে নাই, সেদিন তাহারা তাহার মর্য্যাদা বুঝিল।

কৃষ্ণচন্দ্রের দশাহে (ইহা চতুর্দ্দশ দিবসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে) এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার হইয়াছিল। যে সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়, সে সময়ে সেনহাটি গ্রামে বৈদ্যদিগের তিনটি বিভিন্ন দল ছিল। সামান্য মতভেদ হইতে এই তিনটি দলের মধ্যে শত্রুতার সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত দশাহের দিবস তিন দল বহুদিনের মনোমালিন্য সত্ত্বেও একত্র আহার করিয়াছিলেন। এমন কি ব্রাহ্মণগণও এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন।* ইতিপূর্ব্বে এরূপ ঘটনা একেবারে কল্পনার অতীত বিষয় ছিল, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি সমবেত ভাবে সম্মান দেখাইবার জন্য তাঁহারা এই অসম্ভব ব্যাপারকেও সম্ভব করিয়াছিলেন। যাঁহারা জীবিতাবস্থায় জীবনের যাত্রাপথের উভয়পার্শ্বে অবিচ্ছেদে শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছেন এবং যাঁহাদের মৃত্যুতে তদীয় স্বদেশবাসিগণ সকল ভেদাভেদ ক্ষণকালের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারেন, তাঁহাদের জন্ম সার্থক, মৃত্যুতেও তাঁহারা ধন্য। এরূপ লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে অধিক নহে। কৃষ্ণচন্দ্র সেই স্বল্প-সংখ্যক ভাগ্যবান্ পুরুষদিগের মধ্যে একজন।

কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তি অবিনশ্বর; আমাদের ন্যায় ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তির সাধ্য কি যে তাঁহার কীর্ত্তি স্থায়ী করিবার চেষ্টা করিব? তাঁহার গৌরব আমরা বাড়াইতে পারিব না; কিন্তু তাঁহার গৌরব কীর্ত্তন করিয়া আমরা আমাদিগকেই গৌরবান্বিত করিব। তাঁহার কীর্ত্তি-স্থাপনের চেষ্টা তাঁহার প্রীত্যর্থে নহে, সে আমাদেরই প্রীত্যর্থে। তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরাই কৃতার্থ হইব। তাঁহার ন্যায় মহাত্মা সামান্য ব্যক্তির মত আপনার কীর্ত্তিস্তম্ভদর্শনে হর্ষোৎফুল্ল হইতে পারেন না। কৃষ্ণচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর সেনহাটির কয়েকজন

* শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কথিত।

উৎসাহী যুবক ও শিক্ষিত ব্যক্তির চেষ্টায় তাঁহার একটি স্মৃতি সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত দাশ গুপ্ত বি, এ উক্ত সমিতির সম্পাদক। ১৩১৫ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাসে সেনহাটিতে কবির জন্মভূমির উপর কৃষ্ণচন্দ্রের নামে একটি মেলার অধিবেশন হইয়াছিল। বহু দোকানী পশারী এই উপলক্ষে মেলাক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল। ভৈরবের তীর হইতে কবির ভিটা পর্য্যন্ত পত্রপুষ্পের তোরণ রচিত হইয়াছিল। নানাস্থানে কবির কাব্য হইতে সুন্দর সুন্দর বাক্য পতাকার গায়ে অঙ্কিত করা হইয়াছিল। মেলা সমস্তদিন ছিল। দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপকবর্গ, কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল প্রভৃতি মেলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐদিন সন্ধ্যায় কবির গৃহের বহিঃপ্রাঙ্গণে একটি সভার অধিবেশন হয়। সুপ্রাচীন শ্রীযুক্ত শ্যামলাল সেন মুন্সী মহাশয় সেই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ নাগ এম্, এ, প্রচারক শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল, বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হীরালাল সেন ও সেনহাটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ বক্তৃতা করেন। দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। রাত্রি আট ঘটিকার পর এই সভা ভঙ্গ হয়।

সম্প্রতি ভৈরবের তীরে কৃষ্ণচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশে একটি স্তম্ভ রচিত হইতেছে। কীর্ত্তিদেবী স্বহস্তে যাঁহার কণ্ঠে বরমালা অর্পণ করিয়াছেন, দেবী বীণাপাণি স্বহস্তে যাঁহার মস্তকে অক্ষয় যশের মুকুট পরাইয়া দিয়াছেন, অগ্রগামী কবিগণ যাঁহাকে অমরলোকে আপনাদের পার্শ্বে আসন দান করিয়াছেন,তাঁহার আর ইষ্টকের কীর্ত্তি-

স্তম্ভের প্রয়োজন কি? কোন্ দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তি সে কথা কল্পনা করিতে পারে? এ অনুষ্ঠান কৃষ্ণচন্দ্রকে অমর করিবার জন্য নয়। তাঁহার তর্পণের অধিকারী ভক্তবৃন্দের ভক্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র, সুতরাং সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধার সামগ্রী। কিন্তু ইহাতেই তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রকাশের চূড়ান্ত হইতে পারে না। তিনি যে অপূর্ব্ব জীবনের আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহা আমাদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে।

তিনিই ধন্য যিনি জীবিতাবস্থায় লোকের শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন এবং দেহান্তেও মানবসমাজের আদর্শরূপে অন্ধকারময় জীবনের যাত্রাপথে বিমল আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিক্‌ভ্রান্ত পথিককে তাহার গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেন। কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার শিক্ষক সুপ্রাচীন শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় যথার্থই বলিয়াছিলেন,—"কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুতে মাতৃস্থানীয়া সেনহাটি গ্রাম একটি সুপুত্র হারাইয়াছেন। বোধ করি সেনহাটির ভূমি অচেতন জড়পদার্থ না হইলে পুত্র শোকাতুরা মাতার ন্যায় অশ্রুপাত করিতেন।"

পরিশিষ্ট।



ইতিকথা সংগ্রহ।

[কৃষ্ণচন্দ্র সম্পর্কে নানাস্থানে নানাবিধ ইতিকথা প্রচলিত আছে। মূল গ্রন্থের মধ্যে তাহাদের সবগুলি সন্নিবেশিত করা নানা কারণে সঙ্গত বোধ হয় নাই। পরিশিষ্টে সেগুলি সন্নিবেশিত হইল।]

(১)

ঢাকায় অবস্থানকালে কৃষ্ণচন্দ্রের রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতের সমাদর ও বহুল প্রচার দেখিয়া যাত্রাওয়ালাগণ তাঁহাকে যাত্রার গান রচনার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি অনেকগুলি পালার গান রচনা করিয়া দিয়াছিলেন।

(২)

একবার খুলনার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন বি, এল্ মহাশয় যশোহর হইতে সেনহাটি আসিবার সময় দৌলতপুর ষ্টেশনে নামিয়া দেখেন মজুমদার-কবিও সেই ট্রেণে বাড়ী যাইবার জন্য যশোহর হইতে আসিয়াছেন। দৌলতপুর হইতে সেনহাটির ঘাট পর্য্যন্ত নৌকায় দুই আনা ভাড়া লাগিত। কৃষ্ণচন্দ্র অন্যান্য বার দুই আনায় একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া বাড়ী যাইতেন। মাঝি পথে যদি আরও দুই একজন লোক লইত তাহাতে তিনি আপত্তি করিতেন

না। মাঝিরাও দু পয়সা অধিক পাইত। এইবার তিনি ষ্টেশন হইতে বাহির হইতেই মাঝিরা তাঁহাকে ধরিল ; কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন, "আমার কাছে মাত্র ছয়টি পয়সা আছে,আজ নৌকায় যাইতে পারি না, হাঁটিয়া গিয়া খেয়া পার হইব।" মাঝিরা তথাপি তাঁহাকে লইতে চাহিল, তিনি তাহাদের কথা গ্রাহ্য করিলেন না। বিপিনবাবুর নৌকা পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল, তিনিও বহুবার তাঁহার নৌকায় যাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন,কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র কাহারও কথায় টলিবার পাত্র ছিলেন না, পদব্রজেই গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ইহা ইংরাজী ১৮৯২ সালের কথা। ইহার পর বৎসর কৃষ্ণচন্দ্র পেন্সন গ্রহণ করেন।

(৩)

যশোহর হইতে পেন্সন লইয়া বাড়ীতে আসিলে তাঁহাকে প্রতি মাসে পেন্সনের টাকা লইবার জন্য খুলনা ট্রেজারিতে যাইতে হইত। মৌলভি আবদুল খালেক নামক জনৈক ডেপুটি জানিতে পারেন যে সদ্ভাবশতকপ্রণেতা বৃদ্ধ-কবি তাঁহার নিকট হইতে পেন্সন লইয়া যান অথচ তিনি তাঁহাকে চিনেন না। ইহা জানিয়া তিনি তাঁহার অধীন কর্ম্মচারিবৃন্দকে বলিয়া দিলেন যে কৃষ্ণচন্দ্র আবার যখন পেন্সন লইতে আসিবেন তখন যেন তাঁহাকে জানানো হয়। ইহার পর মাসে কৃষ্ণচন্দ্র পেন্সন লইতে আসিলে কর্ম্মচারিগণ উক্ত ডেপুটীকে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা জানাইলেন। যখন ডেপুটির আহ্বানে কৃষ্ণচন্দ্র এজলাসের নিকটস্থ হইলেন তখন উক্ত ডেপুটি স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া স্বীয় আসনের পার্শ্বে তাঁহাকে বসাইয়া কিয়ৎক্ষণ তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিলেন। উক্ত ডেপুটি বলিয়াছিলেন, "আমি মূল হাফিজ ও অন্যান্য পারসিক কবিদিগের গ্রন্থ পড়িয়াছি। আপনার বিশেষত্ব এই যে আপনি তাঁহাদের ভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও শুধু

অনুবাদে আপনার গ্রন্থ পূর্ণ নহে। আপনি যথার্থ উচ্চশ্রেণীর কবি।"

(৪)

প্রতি বৎসর গ্রীষ্ম ও পূজার অবকাশে কৃষ্ণচন্দ্র যশোহর হইতে বাড়ীতে আসিতেন। খুলনার মোক্তার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সেন মহাশয় বলেন বাল্যকালে একবার তিনি গ্রীষ্মাবকাশে সেনহাটির বাজার হইতে এক পয়সার কলা কিনিয়া আনিবার সময় দেখেন কৃষ্ণচন্দ্রও বাজারে প্রবেশ করিতেছেন। রাসবিহারীবাবুকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলা কয়টা করিয়া কিনিলে?" এক পয়সায় তিনি পাঁচটী চাঁপা কলা কিনিয়াছিলেন, তাহাই বলিলেন। কোন্ দোকান হইতে কলা কিনিয়াছেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে রাসবিহারীবাবু দূর হইতে অঙ্গুলি দ্বারা দোকানটি দেখাইয়া দিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র সেখানে গিয়া এক পয়সার কলা চাহিলে দোকানদার তাঁহাকে ছয়টি কলা দিল। কৃষ্ণচন্দ্র দোকানদারকে বলিলেন, "একি? তুমি ঐ বালককে পাঁচটি দিয়াছ, আর আমাকে ছয়টী দিতেছ! তবে উহাকে বালক পাইয়া প্রবঞ্চনা করিয়াছ? আমি এরূপ প্রবঞ্চকের জিনিস খরিদ করিনা। তোমার কলা তোমার থাক্।" ন্যায়ের প্রতি তাঁহার অনুরাগ চিরদিনই এইরূপ অটল ছিল।

(৫)

তাঁহার স্বাবলম্বন স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল। বৃহত্তম হইতে ক্ষুদ্রতম বিষয়েও তিনি আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে ভাল বাসিতেন। অন্ধাবস্থাতেও তিনি একটি যষ্টি সম্বল করিয়া বাজার হাট প্রভৃতি যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিজেই নিষ্পন্ন করিতেন।

(৬)

ভৃত্যের প্রতিও তাঁহার সখ্যভাব ছিল।

(৭)

তাঁহার অতি আশ্চর্য্যজনক বাক্‌সংযম ছিল। গৃহে অবস্থানকালে এরূপ হইয়াছে যে দিনের পর দিন তিনি একটি মাত্রও কথা কহেন নাই। প্রত্যুষ হইতে মধ্যাহ্ন্‌কাল পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া স্নানান্তে যাহা পাইতেন তিনি তাহাই আহার করিতেন। আহারান্তে আবার পড়িতে বসিতেন এবং সন্ধ্যায় যতক্ষণ দৃষ্টি চলিত তিনি ততক্ষণ অধ্যয়ন হইতে বিরত হইতেন না। কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সাদরে বসাইতেন, কিন্তু স্বয়ং কোনোরূপ প্রশ্ন করিতেন না; যিনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেন তাঁহাকে তাহার উত্তর দিতেন মাত্র। তিনি জানিতেন বহুভাষী ব্যক্তি মিথ্যা কথা না বলিয়া থাকিতে পারে না। অনেকে জীবনের কালবিশেষ মৌনাবস্থায় যাপন করিয়া বাক্‌সংযম অভ্যাস করেন, কৃষ্ণচন্দ্র আজীবনই বাক্‌সংযমব্রতধারী ছিলেন।

(৮)

গ্রামে বা অন্য কোথাও সভাসমিতি হইবে এরূপ বিজ্ঞাপিত হইলে কৃষ্ণচন্দ্র নির্দ্দিষ্ট সময়ে গিয়া উপস্থিত হইতেন। সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে তিনি আশ্চর্য্যরূপে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। সময়ে সময়ে সভাসমিতির উদ্যোগকর্ত্তৃগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভায় উপস্থিত না হইলেও তিনি কখনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে উপস্থিত হইতেন না। যশোহরে অবস্থানকালে তিনি সর্ব্বদাই নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতেন। তিনি স্নান করিয়া আহারে বসিয়াছেন এমন সময়ে বিদ্যালয়ের ঘণ্টা বাজিতে শুনিয়া তৎক্ষণাৎ

আহার ত্যাগ করিয়া বিদ্যালয়ে চলিয়া গিয়াছেন এরূপ ঘটনা দুই একবার ঘটিতে শুনা গিয়াছে।

(৯)

যশোহর বিদ্যালয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সংস্কৃত পড়াইতেন। মুসলমান মৌলভিগণ পারস্য ভাষা শিক্ষা দিতেন। পারস্যভাষায় কৃষ্ণচন্দ্রের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দেখিয়া প্রধান শিক্ষক কখনো কখনো বার্ষিক পরীক্ষার সময় তাঁহাকে উচ্চতর শ্রেণীর পারস্য ভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত করিতেন। মুসলমান মৌলভিগণ তাঁহার এই নিয়োগ সানন্দে অনুমোদন করিতেন।

সঙ্গীত-সংগ্রহ।

কৃষ্ণচন্দ্রের রচিত কয়েকটি সঙ্গীত গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত* হইয়াছে। ব্রহ্মসঙ্গীত ও অন্যান্য স্থান হইতে সংগৃহীত আরও কয়েকটি সঙ্গীত এস্থানে সন্নিবেশিত হইল।

ললিত—আড়া।

অয়ি সুখময়ি ঊষে ? কে তোমারে নিরমিল !
বালার্ক সিন্দূর ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল ?
হাসিতেছ মৃদু মৃদু, আনন্দে ভাসিছে সবে,
কে শিখাল এত হাসি, কেবা সে যে হাসাইল ?
জগত মোহিত করি, গাইছ বিপিনে কারে
বল কে সে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিছ যারে !
কমল-নয়ন খুলে, কার পানে চেয়ে আছ,
কার তরে ঝরিতেছে প্রেমঅশ্রু নিরমল !

এই ছিল জীবগণ, মৃতপ্রায় অচেতন,
তব পরশন মাত্র, পাইল নবজীবন।
বারেক তুমি আমারে, দেখাও দেখাও দেখি তারে
হেন সঞ্জীবনী শক্তি যে তোমারে প্রদানিল।

বেহাগ—আড়া।

পিতঃ, ক্ষম অপরাধ, অবোধ সন্তান আমি।
না শুনে তোমার কথা, করেছি কুকাজ কত,
হেলায় সুপথ ছেড়ে হয়েছি কুপথগামী।
স্বাধীনতা-মহারত্ন, স্নেহে মোরে দিয়া তুমি,
পাঠালে ভবের হাটে সুধা কিনিতে;
হায় আমি কি করিলাম, বলিতে বিদরে হিয়ে,
কিনিলাম সেই রত্নে, পাপতাপ দুঃখরাশি!

বেহাগ—আড়া।

শান্তি কোথা আছে আর। (অমৃত সাগর বিনা।)
ভুলে সে অমৃত যেই, বিষয় বিষের কুণ্ডে,
করে শান্তি অন্বেষণ, ভ্রমবুদ্ধি তার।
ওরে সন্তাপিত জীব, বৃথা কেন ভ্রমিতেছ,
কাঁদিতেছ ভবারণ্যে হ'য়ে শান্তিহারা;
অমৃত-সাগরে যাও, যাবে তাপ পাবে শান্তি,
সকলেরি প্রতি আছে, মুক্ত তাঁর দ্বার।

ঝিঁঝিট—আড়া।

কেন তাঁরে ভুল, সে কি ভুলিবার ধন ?
জান না সে যে তোমার জীবনের জীবন
যে তোমারে একক্ষণ, ভুলে না ভুলে না মন,
তাঁরে কি তোমার ভোলা উচিত কখন ?
ভুলিছ তুমিত তারে, ভুলৃত যদি সে তোমারে
ছিলে যখন মাতৃগর্ভে, কি হত তখন ?

বাগেশ্রী—আড়া।

সীমা কে জানে ? জননী !
স্নেহ-জলধির তব।
আমাদের সুখহেতু কত না করেছ তুমি,
প্রতিক্ষণ সাক্ষ্য তার, দিতেছে বিনোদ ভব।
শিখিপুচ্ছে কে চিত্রিল ? পুষ্পদামে কে রঞ্জিল ?
বিহঙ্গের কণ্ঠে এত, মধুরতা কেবা দিল ?
কে করিল শ্রান্তিহরা, নিদ্রা আর রজনীরে ?
কে আর করিবে, তোমার স্নেহের কার্য্য এ সব !

খাম্বাজ—মধ্যমান।

প্রবল সংসার স্রোত আমরা দুর্ব্বল অতি,
কেমনে করিব নাথ প্রতিকূল মুখে গতি !
যেদিকে বহিছে স্রোত, যেতেছি সে দিকে ভেসে
নিকটে নরকাবর্ত্ত, কি হবে কি হবে গতি ?
দুর্ব্বলের বল তুমি, দেহ নাথ মনে বল
সংসার জলধিমাঝে নিস্তার জগতপতি।

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের

সঙ্গীত।

কে করিল দিবাকর! রচনা তোমার,
স্থাপিল কে তোমায় সৌর-জগত কেন্দ্রে?
কি আশ্চর্য্য তব জ্যোতি! নাশিছে ভব-তিমিরে,
অহো, এই জ্যোতি কোন্ জ্যোতির জ্যোতি?
এই উপগ্রহ কত, নিয়ত দুর্লক্ষ্য বেগে,
তোমার প্রকাণ্ড মূর্ত্তি করিতেছে প্রদক্ষিণ।
কে করিল এ বিধান? কোথা সে বিধাতা?
অচিন্ত্য তাঁর শকতি, সীমা কে জানে?
প্রতিদিন ঊষাকালে, উদয়-অচলে দেখি,
সায়াহ্নে প্রবেশ কর, পশ্চিম জলধি-জলে।
কার সৃষ্টি এ কৌশল? ধন্য কৌশলকারী,
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

উপনিষদের শ্লোকের ছায়া এই সঙ্গীতটিতে প্রতিফলিত হইয়াছে। পাঠক উদ্ধৃত সঙ্গীতটির সহিত এই শ্লোকটি পাঠ করিলেই ভাবসাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন—

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

শেষ পংক্তিতে উপনিষদের শুধু ছায়া নয়, কায়ার একাংশও দেখা দিয়াছে।

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সেন বক্সী মহাশয়ের উল্লিখিত. রামকুমার সরকার গুরুমহাশয়ের রচিত কুইনাইন-মাহাত্ম্য সম্বন্ধীয় গানটি এখানে উদ্ধৃত হইল।

কুইনাইন-মাহাত্ম্য।

জগবন্ধু চিকিৎসা খুব করে। (ধুয়া) শোয়ারির পরে ডঙ্কা মারে কুনিয়ানের জোরে।

টাকায় বেচে তিন মোড়া * সাক্ষী তার যুগলে খোঁড়া +
খাওয়ায় বড়ী ধরে নাড়ী অমনি বাহির করে।

কুনিয়ানের কেমন মজা, পীতাম্বর ‡ তার পাচ্ছেন সাজা, বৎসরাবধি নজরবন্দী জ্বরে।

রঘুনাথকে আছে জানা, গোঁফ জুড়ি তার সম্ভাবনা, নিদানেতে পাতকানা § গুমনেতে মরে।

পরাণদাসের ছাওয়াল দীনে, সেও আন্‌লে নিদান কিনে, যার বাপে খেত বোঠে টেনে সেও নাড়ী ধরে।

জগবন্ধু চিকিৎসা খুব করে।

ব্রজসেন কবিরাজ ভারি, বৈদ্যমধ্যে গণ্য করি, বলে শম্ভুনাথে ¶ সার্‌তে পারি, টাকা দিলে মোরে।

* * * চিকিৎসাতে মজবুত, মিত্রবাড়ী খেয়ে জুতো যান্ না খালিসপুরে।

* মোড়ক। + 'যুগল' নামক জনৈক খঞ্জ। ‡ পীতাম্বর সেন, সেনহাটির বিশ্রুতকীর্ত্তি কবিরাজ। § যে ব্যক্তি গ্রন্থের সোজা উল্টা বুঝে না অর্থাৎ জ্ঞানশূন্য।

¶ একপ্রকার বিষঘটিত উত্তেজক ঔষধ, রোগীর শেষ অবস্থায় বৈদ্যেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সংবাদপত্রে কৃষ্ণচন্দ্র।

[জীর্ণপর্ণকুটিরবাসী, দরিদ্র কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই খুলনা জেলার সাপ্তাহিক মুখপত্র "খুলনাবাসী" যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা গেল। খুলনাবাসীর বৃহৎ কলেবর ঐ একটি প্রবন্ধেই পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং সমগ্র প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করা অসম্ভব।]

খুলনাবাসী।

৫ই মাঘ, শনিবার, সন ১৩১৩ সাল।

"কবিকুলচূড়ামণি দেশবিখ্যাত "সদ্ভাবশতক" ও "কৈবল্যতত্ত্ব" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা কৃষ্ণচন্দ্র আর ইহ জগতে নাই। গত ২৯শে পৌষ রবিবার প্রাতঃকালে শ্লেষ্মাঘটিত জ্বররোগে কৃষ্ণচন্দ্র দেহত্যাগ করিয়াছেন। ঐ দিবস গ্রামবাসিগণ ভৈরবনদতীরে কৃষ্ণচন্দ্রের দেহ ভস্মীভূত করিয়াছেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের অভাবে সেনহাটি গ্রামনিবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আজ দুঃখে ম্রিয়মাণ। প্রকৃত পক্ষেই কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুতে সেনহাটি গ্রামের, শুধু সেনহাটির কেন, সমগ্র বঙ্গের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে।

* * *

কৃষ্ণচন্দ্র মাত্র কবি ছিলেন না। তিনি মাত্র কবিতা রচনার জন্য দেশে বিখ্যাত ছিলেন না। কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন আলোচনা করিলে তাঁহার মধ্যে এমন সমুদয় মহদ্‌গুণ দেখিতে পাওয়া যাইবে যাহা প্রকৃত পক্ষেই শিক্ষণীয় এবং অনুকরণীয়।

এইরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস লইয়াই তিনি এই নশ্বর জীবন পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করিয়াছেন। তবে বুঝিলাম না যে যাঁহারা অমর কবি, তাঁহারা কেন শেষজীবনে অন্ধতাজনিত ক্লেশ সহ্য করিতে বাধ্য হয়েন। পত্রান্তরে সেদিন পড়িয়াছিলাম যে বুঝি বা বহির্জগতের দৃষ্টি অন্তর্জগতে নিবিষ্ট হওয়াই ইহার প্রধান কারণ।

তবে যাও কবি! সেই অমরধামে যাও—যাও সেখানে, যেখানে জ্বালা নাই, যন্ত্রণা নাই, অন্নকষ্ট নাই, যাও সেইখানে, যেখানে জরা নাই, মৃত্যু নাই—অন্ধতাজনিত ক্লেশ নাই। তুমি এ জগতে যে সরলতা, ধর্ম্মপ্রাণতা এবং প্রত্যেক বিষয়েই প্রগাঢ় বিশ্বাসের পরিচয় দিয়া গিয়াছ, পরজীবনে তাহার সুফল ভোগ করিবেই করিবে। তোমার যে সদ্ভাবশতকের বিক্রয়লব্ধ অর্থে একজন আজ মহাধনী বলিয়া পরিচিত, তুমি তাহার গ্রন্থকর্ত্তা হইয়াও চিরকাল সামান্য পর্ণকুটিরে বাস করিয়া সময় সময় যথেষ্ট অর্থকষ্ট ভোগ করিয়াও প্রলোভন ত্যাগের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছ। তুমি যেখানে গিয়াছ সে স্থানে নিশ্চয়ই স্বর্গসুখ ভোগ করিবে। * * * ভগবানের নিকট আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি শ্রীমান্ উমেশচন্দ্র তোমারই ন্যায় ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইয়া সংসার যাত্রানির্ব্বাহ করিবেন।

আমরা আজ হৃদয়ের সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের শোকসন্তপ্ত পরিবারের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।”

ঐ সংখ্যার খুলনাবাসীতে একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, আমরা উহাও কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

কবি কৃষ্ণচন্দ্র বিয়োগে।

"দারুণ নিদাঘকালে নিশীথ সময়"
বসি আর "কামিনীকুসুম তরুতলে"
অবচয়ি নানাজাতি সুরভি প্রসূনে
কে গাঁথিবে মনোহর মালা সুচিকণ?
হাফেজের সুগভীর কাব্যের সাগরে
অবগাহি', সমুজ্জ্বল বিবিধ রতন
আহরিয়া বাণিপদে কে দিবে অঞ্জলি?
যাও তুমি কবিবর ত্রিদশ আলয়ে,
স্বর্গের দুয়ার খুলি দেখ দাঁড়াইয়া
জয়দেব, হেমচন্দ্র, হাফেজ, বঙ্কিম,
দত্তজ মধুসূদন, গুপ্ত কবিবর,
যশস্বী ভারতচন্দ্র, ধীমান্ ঈশ্বর,
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস আর
বিবিধ মাঙ্গল্য হস্তে তব অপেক্ষায়।
যতদিন বঙ্গদেশ, বঙ্গভাষা রবে
ততদিন কবি তুমি রহিবে অমর।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কবি কৃষ্ণচন্দ্রের দেহান্তের পরেই মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের পৃষ্ঠপোষকতায়, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত "উপাসনা" পত্রিকায় দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ, একটি সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

কবির জীবিতাবস্থাতেই "অনুসন্ধান" নামক পত্রে ও বালক-বালিকাদিগের জন্য প্রকাশিত "মুকুল" নামক মাসিক পত্রে তাঁহার জীবনের কতকগুলি ঘটনার কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য সময়ে সময়ে তাঁহার অজ্ঞাতসারে ও সর্ব্বদাই তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে লোকে তাঁহাকে এইরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে।



ভ্রম সংশোধন।

(১)

এই গ্রন্থের ৫০ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে ৺দ্বারকানাথ সেন মহোদয় সেনহাটিতে দ্বিতীয়বার বিবাহকালে কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিতে তাঁহার আলয়ে গিয়াছিলেন। ইহা ভ্রমবশতঃ লিখিত হইয়াছে। দ্বারকানাথ বিবাহ করিতে সেনহাটিতে আসিয়াছেন শুনিয়া কৃষ্ণচন্দ্রই তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। উল্লিখিত ঘটনার অন্যান্য অংশ ঠিক আছে।

(২)

কৃষ্ণচন্দ্র কিছুদিন দৌলতপুর বিদ্যালয়ে পণ্ডিতের কার্য্য করিয়াছিলেন। অতিঅল্পকালই তিনি সেখানে কাজ করিয়াছিলেন এবং এই কার্য্যকালে উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা ঘটে নাই এই কারণে উহার উল্লেখ করা হয় নাই। যথাস্থানে ইহার উল্লেখ হওয়া উচিত ছিল।

(৩)

১০২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্তের সহিত শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট পড়িতে যাইতেন। ঐ স্থানে শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু দাশ গুপ্তের নাম হওয়া উচিত ছিল।

গ্রন্থমধ্যে কয়েকটি বর্ণাশুদ্ধি আছে, তাহাদের মধ্যে যে কয়েকটির সংশোধন না হইলে অর্থের অসঙ্গতি হইবার সম্ভাবনা তাহাদের তালিকা দেওয়া গেল।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৫	২২	সংবাদ	সংবাদে
৪৬	১১	মহাশয়ে	মহাশয়
৪৭	৩	ঘটনায়	ঘটনা
৬২	১৯	there mnant	the remnant
৭৩	২৬	and	land
৯০	২৪	ব্রাহ্মসমাজে গিয়া	ব্রাহ্মসমাজে গিয়া একটি খঞ্জকে দেখিয়া
৯৩	১৬	সার	সাধু